মঙ্গলগ্রহের রহস্য
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

মঙ্গল গ্রহের রহস্য-৯৭

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

পায়ের নিচে পথের উপর আশেপাশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মণিমুক্তা এবং মূল্যবান পাথর যার মূল্য পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি টাকা। পথের মাঝে এমনভাবে মূল্যবান বস্তু পড়ে থাকতে দেখে দিপালীর চোখ আনন্দ দ্যুতি খেলে যায়। চোখ দুটো তাঁর ধাঁধিয়ে যায় যেন। তাড়াহুড়া করে পাথর কুড়িয়ে কোচরে তুলতে থাকে সে।

বনহুর দু'একটা পাথর হাতে উঠিয়ে নেয় এবং দেখতে থাকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে।

দিপালী কোচর ভরে ফেলেছে। এত খুশি বুঝি সে কোনো দিন হয়নি। ছোট্ট শিশুর মত উচ্ছল হয়ে উঠেছে দিপালী।

বনহুর দিপালীর আনন্দ উচ্ছলতা লক্ষ্য করে মৃদু হেসে বললো—ও গুলো কি করবে দিপালী?

এগুলো অতি মূল্যবান পাথর তাতে কোনো ভুল নেই আমার ভাল লাগছে রাজকুমার!

জানি এগুলো অতি মূল্যবান পাথর। কিন্তু যে দেশে আমরা অবস্থান করছি সে দেশে এগুলো এত বেশি রয়েছে যে, পথেঘাটে এদিকে ওদিকে বহু ছড়িয়ে আছে। এ দেশের মানুষের কাছে এগুলো মোটেই মূল্যবান নয়.......

এত সুন্দর অপরূপ পাথরগুলো এদেশে মূল্যবান নয়?

হাঁ দিপালী। তুমি ভালভাবে লক্ষ্য করলেই দেখতে পেতে পথের দু'ধারে যে তুষার আচ্ছাদিত টিলাগুলো রয়েছে সেগুলোর গায়ের তুষারের তল থেকে কিছু কিছু উজ্জল তারার মত ঝকমকে বস্তু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো।

হাঁ, আমিও লক্ষ্য করেছি রাজকুমার।

ঐ ঝকমকে বস্তুগুলোই হলো মণি-মাণিক্য জাতীয় পদার্থ। এখানে দালানকোঠা বা ইমারত তৈরি হয়েছে সেগুলো আমাদের পৃথিবীর মানুষের তৈরি দালানকোঠার মত নয়........

হাঁ, আমি এটা লক্ষ্য করেছি। দালানকোঠাগুলো কতকটা পৃথিবীর উই-এর ঢিবির মত কিন্তু কোনোটার ছাদ নেই।

ঠিক বলেছো, দালানকোঠা বা ইমারতগুলো আমাদের দেশের উই-এর ঢিবির মত আর কোনোটারই ছাদ নেই। জানো এই ছাদ না থাকার কারণ কি?

আমি ঠিক অনুমান করতে পারিনি রাজকুমার।

ছাদ না থাকার কারণ হলো এদেশে ঝড় বা বৃষ্টিপাত হয় না বা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এজন্যই হয়তো..........

হাঁ, ঠিক বলছো দিপালী, এক অদ্ভুত রাজ্য এটা। এখানে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে বলে মনে হয় না, তাছাড়া বৃষ্টিপাতও হয় না বলেই মনে হয়। যদিও বৃষ্টিপাত হয় না তবু কত সতেজ ফুলফলে ভরা। শুধু তাই নয়, এদেশের মানুষগুলোকে দেখলেও তাই মনে হয়, কত সুস্থ সবল আর সজীব এরা। সে কারণেই সহজে এরা বুড়িয়ে যায় না।

সত্যি, আপনি যা বলেছেন একেবারে সত্যি। রাজকুমার, এ গুলো পেয়ে আমি কি যে খুশি হয়েছি তা কি বলবো। কথাগুলো বলছিলো আর কোচড়ে তুলে নেওয়া পাথরগুলো বিস্ময়ভরা চোখে নেড়েচেড়ে দেখছিলো। সে তো দূরের কথা, বনহুরও কোনোদিন দেখেনি এমন অপূর্ব অদ্ভুত পাথর। এ পাথরগুলো মূল্যবান তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুর বললো—দিপালী, আমাদের কাছে এ পাথরগুলো মূল্যবান বটে কিন্তু আমাদের পৃথিবীর মানুষের কাছে পাথরের নুড়ি যেমন, ঠিক এই মণি-মাণিক্যগুলোর মূল্যও এদের কাছে তেমনি। সত্যি, এ পাথরগুলোর এক একটির মূল্য আমাদের পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি টাকা হতে পারে।

এগুলো আমি সব নিয়ে যাবো।

বেশ তো, যদি ফিরে যেতে পারি তাহলে কিছু নিতে পারো, আর যদি কোনোদিন আমাদের পৃথিবীর বুকে ফিরে যাওয়া না হয় তাহলে...

বনহুরের মুখে দিপালী হাতচাপা দেয়—রাজকুমার, ও কথা বলবেন না। যেমন করে হোক আপনাকে পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতেই হবে; নাহলে আপনার মা কেঁদে কেঁদে মারা যাবেন।

হাঁ দিপালী, সত্যি, মার কথা মনে হলে আমার বুকটা মোচড়ে উঠে। জানি না মা কেমন আছেন। দীর্ঘকাল আমাকে না দেখে মা বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমি না কোনোদিন আর তাঁর পাশে ফিরে যেতে পারবো কিনা।

রাজকুমার, মায়ের আশীর্বাদ রয়েছে আপনার উপর নিশ্চয়ই ফিরে যেতে পারবেন।

দিপালী! বনহুর গভীর আবেগে দিপালীর একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরে।

বনহুরের স্পর্শ দিপালীর সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ জাগায়। পুলকিত হয়ে উঠে দিপালীর মন, অভিভূতের মত সে বলে উঠে—রাজকুমার!

মায়ের আশীর্বাদ আমার উপর আছে এবং তাঁর আশীর্বাদের জন্যই আজও আমি বেঁচে আছি......চলো দিপালী; ঐ যে রাজপ্রাসাদ দেখা যাচ্ছে আমরা ওখানে যাই। জানি না ওখানে গিয়ে আমরা কি দেখতে পাবো।

দিপালী কোচড়ভর্তি পাথরগুলো নিয়ে চললো।

বনহুরের হাতেও দুটো সুন্দর পাথর ছিলো, সেগুলোও দিপালী কোচড়ে দিয়ে বললো—রাখো দিপালী।

দিপালী ঐ দু'টোও তার কোচড়ে রাখলো। দিপালী আর বনহুর এগিয়ে চলেছে।

সুন্দর প্রশস্ত পথ।

দু'পাশে যে সব টিলা বা উই-এর ঢিবি ছিলো তার গায়ে ঝিকমিক করছে অসংখ্য মণিমুক্তা বা মূল্যবান সুন্দর পাথর। অবাক চোখে দেখতে দেখতে এগুচ্ছে তারা। পথে এবং পথের ধারে ছড়িয়ে আছে অগণিত পাথর।

দিপালীর ইচ্ছে হচ্ছে আরও পাথর সে কুড়িয়ে নেয় কিন্তু নিয়ে সে রাখবে কোথায় বা কি করবে সে। তবু সে মাঝে মাঝে দু'চারটে কুড়িয়ে নিয়ে কোচড়ে রাখছে।

যতই এগুচ্ছে তারা ততই বিস্মিত হচ্ছে। স্নিগ্ধ আলোর ছটায় প্রাসাদের গায়ে দেয়ালে মূল্যবান পাথরগুলো সত্যি তারার মালার মন মনে হচ্ছিলো।

বেশিক্ষণ লাগলো না।

ওরা দু'জন প্রাসাদের প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছে। এত হাল্কাভাবে ওরা হেঁটে এলো কিভাবে নিজেরাই যেন আঁচ করতে পারছে না।

প্রাসাদের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এমন সময় তারা শুনতে পেলো তাদের পেছনে একটা অপূর্ব ঝংকার। সে কি অদ্ভুত অপূর্ব সঙ্গীতের সুর লহরী।

বনহুর আর দিপালী তাড়াতাড়ি একটা টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

টিলাগুলো খুব বেশি উঁচু নয়, তাই ওরা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়লো এবং মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। পেছনে দৃষ্টি চলে যেতেই থ' হয়ে গেলো ওরা। একদল অপ্সরীর মত সুন্দরী তরুণী এগিয়ে

আসছে। হাতে তাদের বীণা। বীণার সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে গানও গাইছে ওরা কিন্তু কণ্ঠস্বর এত মধুর যে বোঝাই যাচ্ছে না তারা গান গাইছে।

বনহুরের কানে মুখ নিয়ে বললো দিপালী—রাজকুমার, দেখুন ওরা একটি পাল্‌কি বয়ে আনছে।

বনহুর বলে উঠলো—হাঁ, ঠিক বলেছো দিপালী, পালকিই বটে। ঐ দেখো ঐ দেখো পালকিটি কিন্তু অদ্ভুত ধরনের।

হাঁ, তাই তো দেখছি। আরও মনে হচ্ছে ঐ পাল্‌কির মধ্যে কিছু বা কেউ আছে।

ঠোঁটে আংগুল দিয়ে চুপ থাকতে ইশারা করলো বনহুর!

ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে পালকি বাহকগণ আর তরুণীদল। অপূর্ব অদ্ভুত সুন্দর মণিমুক্তা খচিত পালকির মধ্যে উপবিষ্টা এক তরুণী।

দিপালী আর বনহুরের চোখে শুধু বিস্ময় নয়, তারা একেবারে আরষ্ট হয়ে যায়। এত রূপ তারা কোনোদিন দেখেনি।

পালকির কোনো দরজা নেই।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এক তরুণী বসে আছে।

রেশমের মত একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে তার কাঁধে-পিঠে। গোলাপের পাপড়ির মত রং মেয়েটির, চোখ দুটো কাজলপরা মনে হলেও আসলে কাজলপরা নয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মতই আপনা আপনি কাজল পরিয়ে দিয়েছে কে যেন তার দু'চোখে।

অবাক হয়ে দেখছে ওরা দু'জন।

পালকিবাহক দু'জন পুরুষ আর সবই নারী। সকলের হাতেই আছে বীণা বা বাদ্যযন্ত্র।

পালকির দু'পাশে দু'জন তরুণী ময়ুরপুচ্ছের মত এক ধরনের চমর দুলিয়ে হাওয়া করছে এবং তারাও পালকির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে গুটি গুটি পায়ে।

মুগ্ধকণ্ঠে বললো বনহুর—অপূর্ব!

বনহুরের আবেগভরা কণ্ঠ দিপালীর কানে কেমন যেন বেসুরো লাগলো। কিছুটা আনমনা হয়ে গিয়েছিলো বনহুর, দিপালী বললো—রাজকুমার!

উঁ!

চলুন এখানে এমনি করে থাকলে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। ওরা চলে গেছে রাজ প্রাসাদটির কাছাকাছি।

ওখানে এ মুহূর্তে যাওয়া কি ঠিক হবে?

তাহলে কি করবো আমরা?

এখানে অপেক্ষা করবো যতক্ষণ না ওরা ফিরে যায়।

আপনি কি মনে করেন ওরা ফিরে যাবে?

হাঁ, কোনো কারণে ওরা ঐ প্রাসাদে গেলো, নিশ্চয়ই ফিরে আসবে

কিন্তু অতক্ষণ এখানে এভাবে থাকতে পারবো আমরা?

পারতে হবে দিপালী।

বেশ, তাই হোক।

বনহুর আর দিপালী প্রতীক্ষা করছে কখন ওরা ফিরে আসবে। যতক্ষণ ফিরে না আসে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত। তাদের বসে থাকতে হবে।

সময় এগিয়ে যাচ্ছে। বসে বসে ঝিমিয়ে পড়ে ওরা দু'জন।

বনহুর বলে—বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

দিপালী বলে—আমার কিন্তু মোটেই ঘুম পাচ্ছে না, যতক্ষণ না ঐ প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম না হয়েছি.....রাজকুমার, আপনি ঘুমান।

বনহুর টিলার দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে। স্নিগ্ধ সমীরণ তার দেহে কোমল পরশ বুলিয়ে চলেছে। চোখে ঘুম নেমে আসে।

দিপালী নির্বাকী নয়নে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুদিত আঁখি দুটির দিকে। ঐ মুখ ঐ চোখ সত্যিই অপূর্ব, যার সঙ্গে সৌরজগতের অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা পুরুষগুলোরও তুলনা হয় না। দিপালী স্থিরদৃষ্টি মেলে দেখছিলো বনহুরের মুখখানা। ভাবে দিপালী, জীবনে সে অনেক পুরুষ দেখেছে কিন্তু এমন পুরুষ সে দেখেনি যার মধ্যে রয়েছে এমন অদ্ভুত গুণাগুণ। পৌরষদীপ্ত মুখমন্ডল বলিষ্ঠ বাহু, প্রশস্ত ললাট, তেমনি বলিষ্ঠ মন। লোভ মোহ লালসা যার মধ্যে এতটুকু প্রশ্রয় পায়নি, যার মন দেবতার মত পবিত্র সেই মহাপুরুষ এত কাছে তবু কেন মনে হয় সে কত দূরের জন। যাকে শুধু ভাবাই যায়, যাকে নিয়ে শুধু কল্পনাই করা যায়, স্পর্শ করা যায় না...

কতক্ষণ নীরবে ভাবছিলো দিপালী, হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে যায় প্রাসাদটার দিকে। যে তরুণীদল পালকি বহনকারীদের সঙ্গে বীণার ঝংকার তুলে কিছুক্ষণ পূর্বে চলে গিয়েছিলো তারা ফিরে আসছে।

সবার হাতে বীণা আর মাঝামাঝি পালকিবাহক দু'জন পুরুষ।

তারা এগিয়ে আসছে।

দিপালী ভাবে রাজকুমারকে ডাকবে কিনা।

ঘুমিয়ে আছে থাক্না। দিপালী আপন মনে উঠে দাঁড়ালো, সে একাই প্রাসাদটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, দেখতে ঐ প্রাসাদের মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে। একা একাই দেখে ফিরে এসে জানাবে রাজকুমারকে সব কথা। আশ্চর্য করে দেবে সে রাজকুমারকে।

দিপালী মূল্যবান পাথরগুলো কোচড়ে যত্ন সহকারে নিয়ে এগিয়ে চললো। যাবার পূর্বে সে কয়েকবার ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখলো রাজকুমারকে।

❑

রহমান কৌশলে বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এলো। দেহে তার ক্যারিলং এবং অনুচরদের পোশাক। কেউ তাকে দেখলে চিনতেই পারবেন, এই সেই রহমান বনহুরের বিশ্বস্ত অনুচর। তার মুখে এক মুখ দাড়ী, মাথায় এলোমেলো উস্কুখুস্কু বাবরী চুল। দেহের ওজন ও পূর্বের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। যদিও বন্দীশালায় তাকে খুব কঠিন শাস্তির মধ্যে রাখা হয়েছিলো, তবু দেহ তার রোগা হয়নি।

হয়তো বয়সের দরুণ শরীর কিছুটা ভারী হয়ে এসেছে। তবে বলিষ্ঠতা কমেনি এতটুকু বরং বেড়েছে। আগের চেয়ে আরও বেশি হিংস্র হয়ে ভাবছে রহমান।

চোখে দুটো দিয়ে যেন তীব্র আগুনের ছটা ঠিকরে বের হচ্ছে।

কৌশলে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে রহমান, কিন্তু পালিয়ে যাবে না, সে জানতে চায় সর্দার আর দিপালী কোথায়।

ক্যারিলংডকা নিরুদ্দেশ হবার পর দলের মধ্যে একটা চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার দরুন ভূগর্ভে ক্যারিলং-এর দুর্গ আস্তানার মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে একটা বিরাট গোলযোগ।

যে একজন অনুচর রহমানকে খাবার দিতো তাদের কৌশলে হাত করে নিয়েছিলো রহমান। নানাভাবে ফুসলিয়ে একদিন বন্দীশালার ভেতরে ওদের একজনকে প্রবেশ করিয়ে নেয়, তারপর সে ঐ প্রহরীর পরিচ্ছদ পরে বেরিয়ে

আসতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ সময় ধরে রহমান এই ভূগর্ভে আস্তানায় নিজকে গোপন রেখে নরশয়তান দল যারা দিনের পর দিন দেশের সর্বনাশ সাধন করে এসেছে তাদের মূল রহস্য উদঘাটন করতে চায় সে। তবে তার মনের অবস্থা মোটেই ভাল নয়, কারণ আজও সর্দারের সন্ধান সে পায়নি। সর্দার এবং দিপালী গেলো কোথায়?

রহমান সেদিন মেশিন পরিস্কার করছিলো, এমন সময় হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো হুইসেলের শব্দ, সেকি কানফাটা শব্দ!

রহমান চমকে চোখ তুললো।

আজকাল রহমানকে দেখলে কেউ বলতে বা চিনতে পারবে না। সে একেবারে ক্যারিলং-কো-এর মানুষ বা অনুচর বনে গেছে। এ ক'দিনে রহমান অনেক কিছু সন্ধান লাভে সক্ষমও হয়েছে। তাদের সর্দার বনহুর ও দিপালী কোথায় আছে কেমন আছে আজও সে খুঁজে পায়নি। তবে এ টুকুও সে জানতে পেয়েছে তারা এই গোপন আড্ডাখানায় নেই। তাদের সরানো হয়েছে অন্য কোথাও।

কিন্তু কে তাদের সরালো এবং কোথায় সরানো হলো এটা সে আজও জানতে পারেনি। জানবার চেষ্টা সে অনেক করেছে। আজও করে যাচ্ছে......রহমান হুইসেলের শব্দ শোনামাত্র সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

এমন সময় তার কাঁধে হাত রাখলো একজন পরিচিত অনুচর থাকে সে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে এবং সেও তাকে সমীহ করে চলে। নাম তার জগাইনাথ বর্মা।

রহমান তাকে মিঃ বর্মা বলে, তাই সে খুব খুশি।

ফিরে তাকিয়ে যখন সে দেখলো জগাইনাথ তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালো তখন রহমান হেসে বললো—ব্যাপার কি মিঃ বর্মা?

জগাইনাথ ব্যস্তকণ্ঠে বললো—জানোনা রামচাঁদ ঐ হুইসেলধ্বনি কখন হয়!

রহমান জগাইনাথ বা এই আড্ডাখানার সবার কাছে রামচাঁদ হিসেবেই পরিচিত, কারণ রামচাঁদের ছদ্মবেশেই এখন এখানে অবস্থা করছে।

জগাইনাথের কথায় বললো রহমান মানে রামচাঁদ—আমি ভুলে গেছি কিনা, তাই হুইসেল ধ্বনির.......

দাঁড়িয়ে আছো কেন হা করে, চলো দেখিগে।

রামচাঁদবেশী রহমান জগাইনাথ বার্মার সঙ্গে ছুটলো। ভূগর্ভে যে এত কলকারখানা থাকতে পারে এর পূর্বে রহমান জানতো না। বিস্মিত হতবাক সে, তবে এতদিনে বেশ সয়ে গেছে তার, শুধু তাই নয়—অনেক কিছু জানবার, বুঝবার সুযোগও সে পেয়েছে।

বিরাট মেশিনকক্ষ।

হুইসেলধ্বনিটা ঐ মেশিনকক্ষ থেকেই ভেসে আসছে।

জগাইনাথ সহ রহমান সেই কক্ষে প্রবেশ করলো।

একজন অনুচর নাম তার মিঃ বিশ্বাস, ক্যারিলং এর দক্ষিণ হাত বলা যায়, সে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেশিনের পাশে। তার পাশে যে যন্ত্রটা রয়েছে ঐ যন্ত্রের মধ্য হতেই বের হচ্ছে শব্দটা।

সবাই এসে গেছে তখন মিঃ বিশ্বাস কর্কশ এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ক্যারিলং কোর নিরুদ্দেশ নিয়ে আমরা নানাভাবে সন্ধান চালিয়েও তার কোনো সন্ধান পাইনি। শুধু ক্যারিলংকোই নিরুদ্দেশ হয়নি, নিরুদ্দেশ হয়েছে আমাদের সৌরজগত পরিভ্রমণের 'নিশু' যানটিও।

একজন বলে উঠলো—তাহলে কি 'নিশুকে' নিয়ে কর্তা উধাও হয়েছেন?

হাঁ, 'নিশু'র নিরুদ্দেশের সঙ্গেই রয়েছে কর্তার নিখোঁজ ব্যাপারটা। তার সঙ্গে রয়েছে বন্দীদ্বয় যারা হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। কথাগুলো বললো মিঃ বিশ্বাস। একটু নেমে পুনরায় বললো সে—সৌরজগতেই যদি তিনি গিয়ে থাকেন তবু তো তাঁর ফিরে আসার কথা কিন্তু আজও তিনি ফিরে এলন না বা তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এটা অত্যন্ত ভাবনার করা।

অপর একজন বলে উঠলো—আমাদের সবেচেয়ে শক্তিশালী যে ক্যামেরা আছে, যার দ্বারা আমরা চাঁদের দেশের ছবি গ্রহণ করে থাকি সেই ক্যামেরা দ্বারা আমরা সৌরজগতটা দেখতে চাই। জানি না কর্তা কোথায় আছেন এবং তাঁর সেই 'নিশুর' সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

হাঁ, আমিও তাই দেখবো বলেই তোমাদের সবাইকে ডেকেছি, এখন তোমরা সবাই মত দিলে আমি সৌরজগতটা আমাদের ক্যামেরার সাহায্যে পর্দায় আনতে পারি।

সবাই একবাক্য সম্মতি জানালো।

মিঃ বিশ্বাস তখন পাশের হলঘরের মত কক্ষটার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং একটা সুইচে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার মত একটা ফাঁক বেরিয়ে এলো।

একটা শব্দ হচ্ছে ভিতর থেকে।

এবার য়ারা যেখানে উপস্থিত ছিলো তারা সবাই কক্ষটার মধ্যে প্রবেশ করলো।

সবার সঙ্গে রয়েছে রহমানও।

সেও ওদের দলের একজন বনে গেছে।

এসে দাঁড়ালো ওরা সবাই মিলে।

সামনে মেশিনপত্র এবং এক অদ্ভুত ধরনের পর্দা।

মেশিনপত্রগুলো স্বাভাবিক নয়, সেগুলোও অদ্ভুত ধরনের।

একটা হ্যান্ডেল ঘোরাতে লাগলো মিঃ বিশ্বাস, সঙ্গে সঙ্গে বিকট একটা শব্দ, তারপর গোলাকার একটা চাকার মত থালা বেরিয়ে এলো মেশিনটার ভিতর থেকে। চাকা বা থালার পরিমাপ প্রায় একটা ছাতার সমান হবে। একটা রশ্মি বের হচ্ছে ছাতাটার ভিতর থেকে।

মিঃ বিশ্বাস অপর এক মেশিনে চাপ দিতেই থালা বা ছাতা আকার যন্ত্রটা মেশিনের ভিতরে প্রবেশ করলো, সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ পর্দায় ভেসে উঠলো সৌরজগতের ঝাপসা ছবি। গোলাকার চাঁদটার কিছু অংশ ভেসে উঠেছে পর্দার বুকে। বিরাট বিরাট গর্ত আর ফোকড় পরিলক্ষিত হচ্ছে চাঁদের পিঠে।

রহমান হতবাক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, কারণ তাদের আস্তানায় বহু অদ্ভুত বিস্ময়কর যন্ত্র বা মেশিন আছে কিন্তু এমন ধরনের মেশিন সে ইতিপূর্বে দেখেনি। যে মেসিন দিয়ে সৌরজগতের দৃশ্য পৃথিবীর বুকে গভীর পাতালপুরীর কোনো এক গোপন স্থানে স্পষ্ট নজরে আসছে। রহমান হা করে এ দৃশ্য দেখছিলো। কিছুক্ষণ পূর্বেও তার মনে বাসনা ছিলো ক্যারিলংকোর এই পাতাল গহ্বর থেকে সে পালিয়ে যাবে এবং পুলিশমহলকে সব জানিয়ে এদের ধরিয়ে দেবে। যদি তা না হয় সে ধ্বংস করে দেবে এদের সবকিছু এদেরই ধ্বংসকারী মেসিন দিয়ে। আজ কিন্তু রহমানের মনে নতুন এক চিন্তার উদ্ভব হলো, বিস্ময়কর এ মেসিন নষ্ট করা চলবে, না বরং এই অদ্ভুত মেশিনটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে।

রহমানের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো, কাঁধে হাত রেখে বললো জগাইনথ—আরে ভায়া, হা করে কি ভাবছো? ঐ দেখো সৌরজগতের মেঘের অন্তরালে চাঁদটাকে একখানা গোলাকার ধুসরপিন্ড বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ, তাই মনে হচ্ছে। ওটা তাহলে চাঁদ?

ঐ তো ওটা চাঁদ, বুঝতে পারছো না তুমি...

এমন সময় বলে উঠলো মিঃ বিশ্বাস—দেখো-দেখো চাঁদটার পাশে ক্ষুদ্রাকৃত কোনো বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে বলে মনে হচ্ছে...

কথা শেষ না করেই মিঃ বিশ্বাস অপর এক মেশিনে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো সৌরজগতের দৃশ্যটা। বলে উঠলো মসিহালোরী নামক অনুচরটি—স্যার, ওটাই কর্তার 'নিশু' ওটাই কর্তার নিশু যানটি তাতে কোনো সন্দেহ নেই....

মিঃ বিশ্বাস বলে উঠলো—হাঁ মসিহালোরী, আপনার কথা সত্য, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঐ বস্তুটিই 'নিশু' যান, কিন্তু অমর স্থির হয়ে রয়েছে কেন?

রহমান নিজেও দেখতে পাচ্ছে অদ্ভুত একটা যান যার আকার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না মেঘের ফাঁকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে গোলাকার মেঘের মত বস্তুটি কোনো মেঘ খন্ড নয়, ওটা চন্দ্রপৃষ্ঠ বা চাঁদের দেশ। একটা ধূসর গোলকপিন্ডের মতই লাগছে চাঁদটাকে।

মিঃ বিশ্বাস ক্যামেরার হ্যান্ডেল ঘোরাতে লাগলো, পর্দা থেকে বিদায় গ্রহণ করলো ধূসর বর্ণের গোলাকার বস্তুটা যেটাকে চাঁদ বলে দেখতে পাচ্ছে তারা। সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগুলো এক একটা রূপালী থালা বা গোলাকার বস্তুর মত লাগছে। ধূসর ঝাপসা আকাশে মিট্ মিট্ করছে অসংখ্য তারার প্রদীপ।

রহমান নির্বাক দৃষ্টি মেলে দেখছিলো, সত্যি বিস্ময়কর মেশিন বটে। যার আকর্ষণ শক্তি এত তীব্র এবং শক্তিশালী যে, কোটি কোটি মাইল দূরেও সৌরজগতের সবকিছু ধরা পড়ছে।

এত বিস্মিত বুঝি কোনোদিন হয়নি রহমান।

রহমান যখন বিস্ময়ে আড়ষ্ট তখন হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলো মিঃ বিশ্বাস—মহাশূন্যে এক অদ্ভুত বস্তুর অস্তিত্ব আমি লক্ষ্য করছি।

মিঃ বিশ্বাস তখন চোখে অদ্ভুত ধরনের একটা যন্ত্র লাগিয়ে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে নিপুণ দৃষ্টি মেলে। সৌরজগতের দৃশ্যগুলো অভিভূত করে ফেলেছে। কি আশ্চর্য, চন্দ্রপৃষ্ঠে ক্ষুদ্রাকৃতযানটিও পর্দায় ধরা পড়েছে।

মিঃ বিশ্বাস বলে উঠলো ঐ মুহূর্তে—সৌরজগতে কয়েকটি বস্তু দেখা যাচ্ছে বা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার মধ্যে একটি ভাসমান মনুষ্য দেহও নজরে পড়ছে....

সবাই সমস্বরে বলে উঠলো—সৌরজগতে ভাসমান মনুষ্য দেহ, বলেন কি—

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো।

বিশ্বাস বলে উঠলো—আমার মনে হয় যানটি যখন 'নিশু' মনে হচ্ছে তখন ঐ ভাসমান মনুষ্যদেহটা যে কার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। ভাগ্যিস্ আমাদের ক্যামেরা চন্দ্রপৃষ্ঠের ঐ অংশই গ্রহণ করেছে যে অংশে 'নিশু' আটকে রয়েছে....

অপর ব্যক্তি বলে উঠলো—বিশ্বাস আপনি একটু সরে দাঁড়ান আমি দেখছি।

সরে দাঁড়ালো মিঃ বিশ্বাস, অপর ব্যক্তিটি সেই বিস্ময়কর মেশিনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মেশিনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র আকার ছিদ্রপথে দৃষ্টি রেখে সামনের পর্দার দিকে তাকালো। সে ও বলে উঠলো —হ্যাঁ, আমিও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সৌরজগতে ধূসর রঙের মধ্যে একটি ভাসমান মনুষ্য দেহ স্থির হয়ে আছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আকার বস্তুটার উপরে চোখ রেখেই লোকটা কথাগুলো বললো।

রহমানের বড় ইচ্ছা হচ্ছিলো যে একবার ঐ মেশিনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং চোখ রাখে কিন্তু সে তো নগণ্য এক অনুচর তাই তার এ সখ বা ইচ্ছাটা পূর্ণ হলো না। তবে শুধু রহমান নয়, ক্যারিলংকোর সব অনুচরই বুঝতে পারলো তাদের কর্তা নিশু যান নিয়ে উধাও হয়েছিলো এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে গিয়ে তার যানটি অকেজো হয়ে যায়। তারপর তার কি অবস্থা হয়েছে ঠিক জানা না গেলেও কিছুটা আন্দাজ করা যায়। তাদের শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে এই মুহূর্তে যা তারা দেখছে তা থেকেই বুঝতে পারছে। কাজেই ক্যারিলং এর অনুচর বা কর্মচারিগণ বেশ হৃদয়ঙ্গম করে নিলো আর তাদের কর্তা ফিরে আসবে না।

সবচেয়ে বড় কথা হলো ক্যারিলংকোর বিরাট শক্তি বা ক্ষমতা হলো ধ্বংসকারী মেশিন যা দিয়ে ক্যারিলং পৃথিবীর যে কোনো বস্তু বা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে পারতো।

আজ কত দিনে রহমান এই বিস্ময়কর দলটির সঙ্গে জড়িত থেকে সে অনেক কিছু জেনে নেবার সুযোগ পেয়েছে। শুধু ক্যারিলংকোর গোপন আস্তানার গভীর রহস্য উদঘাটনেই ব্যস্ত নেই, সে ঐ ফাঁকে সন্ধান চালিয়ে চলেছে সর্দার এবং দিপালীর।

রহমান অবশ্য বুঝে নিয়েছে সর্দার এবং দিপালী এই ভূগর্ভে নেই। তারা নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে এখান থেকে, কিন্তু গেলো কোথায়। বেরিয়ে গেলেও নিশ্চয়ই নীরব থাকবে না......

রহমান আপন মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো এমন সময় জগাইনাথ বর্মা বলে উঠলো—চলো ভায়া, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। কর্তা তার নিশুকে নিয়ে যেখানেই যাক, তবে ফিরে আসবেই। তার এই...

রহমান মিঃ বর্মার কথা সমাপ্ত করলো—এই রহস্যপুরী ছেড়ে কোথাও সে থাকতে পারে না।

হাঁ ভায়া, ঠিক বলেছো তুমি। চলো এবার কাজে যাই, এখানে দাঁড়িয়ে এসব দেখলে আমাদের চলবে না।

এগুলো রহমান আর জগাইনাথ বর্মা।

দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীর হয়ে উঠেছে। অবশ্য বন্দীশালায় খাবার দেবার ভারটা হাতে নিয়েছে ছদ্মবেশী রহমান নিজে। যত কাজেই ব্যস্ত থাকবে বন্দীশালায় খাবার দেবার সময় সে হাজির হবে এবং নিজ হাতে বন্দীশালায় খাবার পৌঁছে দেবে।

রহমান কোনো সময় ভুলে যায় না এ কাজটির কথা। অবশ্য কারণ আছে। রামচাঁদ নামক প্রহরী বন্দীশালায় খাবার পরিবেশন করতো, তাকে কৌশলে রহমান বন্দীশালায় আটক রেখে নিজে বেরিয়ে এসেছে এবং রামচাঁদ নামে ক্যারিলং-এর দলবলের মধ্যে নিজকে পরিচিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। নিজের বুদ্ধিবলেই আজও সে এখানে টিকে আছে এবং এদের গভীর রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বন্দীশালার খাবার পরিবেশনে রহমান অথবা রামচাঁদের এত আগ্রহের পেছনে আছে বিরাট উদ্দেশ্য। তাই সে সব কাজের ফাঁকে এ কাজ করতে সচেষ্ট।

রামচাঁদবেশী রহমান প্রতিদিন খাবার পরিবেশন করার ফাঁকে আলাপ করে সত্যিকারের রামচাঁদের সঙ্গে। বড় ভাল এবং বিশ্বাসী লোক রামচাঁদ। নিজের স্বার্থত্যাগ করে, নিজকে অন্ধকারাগারে বন্দী রেখে রহমানকে সাহায্য করে চলেছে। রামচাঁদ ক্যারিলং-এর একজন বিশ্বস্ত অনুচর বা দলের লোক হয়েও সে ছিলো নিষ্ঠাবান। কোম্পানীর কাজ তার মোটেই পছন্দনীয় ছিলো না। বিদেশীদের গুপ্তচর এবং দেশীয় সম্পদ বিনষ্টকারী নরপশুদের একজন

হয়েও সে কেমন করে সৎপথে চলবে, এ চিন্তা সব সময় সে করতো। সে চায় ভাল পথে চলতে।

মাঝে মাঝে রামচাঁদ ভাবতো কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পেতো না। একদিন বন্দীশালায় খাবার দিতে গিয়ে রহমানের সঙ্গে কয়েকটি কথা হয়। রামচাঁদ বুঝতে পারে রহমানের মনের কথা আর রহমানও বুঝতে পারে রামচাঁদের অন্তরের বাসনা কি। তাই এক সময় বন্ধুত্ব জন্মে যায় উভয়ের মধ্যে। উভয়ে বিশ্বাস করে উভয়কে এবং মনের কথা বিনিময় করে উভয়ে উভয়ের কাছে।

রহমান কৌশলে রামচাঁদকে বন্দীশালায় প্রবেশ করিয়ে নিজে রামচাঁদের বেশে বেরিয়ে আসে বাইরে। সেই হতে রামচাঁদ নিজে বেছে নিয়েছে বন্দীশালায় খাবার পরিবেশন করার দায়িত্বভার।

রহমান রামচাঁদের বেশে ক'দিনে অনেক কিছুই জেনে নিতে সক্ষম হয়েছে, এমন কি বিস্ময়কর মেশিন, যে যন্ত্র দ্বারা সৌরজগতের গভীর রহস্যও ধরা পড়ে সেই যন্ত্র চালনাও সে শিখে নিতে সক্ষম হলো।

একদিন সবার অলক্ষ্যে রহমান গিয়ে দাঁড়ালো সেই মেশিনকক্ষে যে মেশিনকক্ষ থেকে সেদিন হুইসেলধ্বনির আওয়াজ বেরিয়ে এসে ছিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই দলবদ্ধভাবে হাজির হয়েছিলো সেইখানে।

আজ সেই কক্ষে রহমান একা এসে দাঁড়ালো।

চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলো।

নানা ধরনের বিস্ময়কর মেশিন এবং কল্‌কজা রয়েছে। অদ্ভুত রহস্যময় যন্ত্রগুলো যেন তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে।

রহমান সেই মেশিনটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সে মেশিনটার হ্যান্ডেল ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে সৌরজগতের ছবি বা দৃশ্য ভেসে ওঠে পর্দায়। পাশের সুইচ টিপতেই পর্দায় ভেসে উঠলো চলচ্চিত্রের মত একটির পর একটি দৃশ্য। অতীব বিস্ময়কর সৌরজগতের দৃশ্যগুলো। গোটা সৌরজগতের উপরে যেন ক্যামেরাটি সাঁতার কেটে ভেসে বেড়াচ্ছে।

রহমান দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখছে।

ধূসর আকাশে অসংখ্য আলোর বলের মত ভাসছে তারাগুলো। চাঁদটাকে একটি ধূসর রূপালী থালার মত মনে হচ্ছে। মেঘগুলো হাল্কাভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে ভাসমান নৌকার মত।

অপর এক সুইচে চাপ দিতেই চাঁদের পৃষ্ঠদেশ স্পষ্টভাবে ভেসে উঠলো। বড় বড় টিলার মত সারি সারি পর্বতমালা, মাঝে মাঝে বিরাট আকার গর্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। রহমান একটির পর একটি সুইচ টিপে চলেছে। একটা সুইচ বেশ দূরে, রহমান সেই সুইচটায় চাপ দিতেই সম্মুখ পর্দায় ভেসে উঠে এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

চাঁদের পিঠে বড় বড় গর্তগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। একটি গর্তে দৃষ্টি পড়তেই স্তম্ভিত হলো রহমান, দেখতে পেলো একটি বিরাট কোন বস্তু ঠিক গোলাকার পাথরের মত কিন্তু জমকালো। পাথরটা নড়ছে, একটু একটু দুলছে যেন। ক্যামেরার আকর্ষণ ক্ষমতা লক্ষ্য করে রহমানের বিস্ময়ের সীমা নেই কিন্তু ঐ কালোমত বস্তুটাকে ক্যামেরায় ক্ষুদ্রাকৃতি মনে হলেও সেটা যে একটা বিরাট আকার কিছু তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রহমান খুব ভালভাবে তাকালো, বস্তুটা কোনো জীবন্ত প্রাণী বলে মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এলো গর্ত থেকে।

অদ্ভুত একটা জীব এটা বুঝতে বাকি রইলো না রহমানের। তাহলে চাঁদের পৃষ্ঠদেশেও প্রাণী রয়েছে। কেউ না জানুক রহমান বুঝতে পারলো, সে তখনও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টি তার সম্মুখস্থ পর্দায়। সেই বিস্ময়কর গোলাকার বস্তুটা একটি জীব তাতে কোনো সন্দেহ রইলো না, কারণ সেই বস্তুটি গর্তমধ্য হতে দুলতে দুলতে উঠে এলো উপরে এবং চলতে লাগলো।

এমন সময় রহমান পিঠে একটা শীতল বস্তুর কঠিন স্পর্শ অনুভব করলো।

চমকে ফিরে তাকালো রহমান, দেখলো তাদেরই দলের একজন নেতা দাঁড়িয়ে আছে তার পিঠে রিভলভারের আগা ঠেকিয়ে। চোখ দুটো তাঁর আগুনের ভাটার মত জ্বলছে।

রহমান সুইচ টিপে দিতেই অন্ধকারে ডুবে গেলো চারিদিক।

ঠিক ঐ মুহূর্তে রহমান প্রচন্ড এক ধাক্কায় লোকটিকে ফেলে দিলো মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হলো।

লোকটার হাতের রিভলভারের গুলী ছিটকে বেরিয়ে এসে আঘাত করলো সেই বিস্ময়কর মেশিনের মিটারে।

গুলীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড একটা আওয়াজ হলো। রহমানের দেহটা সহ মেশিনগুলো যেন খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো। গোটা পৃথিবীটা যেন ধ্বংস হয়ে গেলো এক নিমিশে।

তারপর আর কিছু মনে নেই রহমানের।

যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন সে চোখ মেলো তাকালো। প্রথমে কিছু স্মরণ হচ্ছে না তার, ভাল দেখতেও পাচ্ছে না কিছু। ধীরে ধীরে হাতখানা তুলে মাথায় রাখলো, কিন্তু একি, গোটা মাথাটা জপ্ জপ্ করছে, যেন মাথায় আলকাতরা মাখিয়ে রেখেছে কেউ।

বাম হাতখানা তুলতে গেলো কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলো রহমান, হাতখানা তার আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না।

রহমান নিজ দেহের উপরে এবং চারপাশে চাপ চাপ পাথর পড়ে রয়েছে অনুভব করলো, কারণ দেহটা সে কিছুতেই নড়াতে পারছে না। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও বুঝতে পারছে না। ঠিকমত স্মরণও করতে পারছে না তার কি হয়েছে।

নীরবে চোখ বন্ধ করে রইলো রহমান।

ক্ষুধা-পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তার মৃত্যু ঘটবে।

চুপচাপ পড়ে রইলো রহমান।

আবার কেটে গেলো কয়েক ঘন্টা। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো সে।

এবার যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো তখন ক্ষীণ একটা শব্দ ভেসে এলো তার কানে। শব্দটা কঠিন পাথরে হাতুড়ির আঘাত বলে মনে হচ্ছে। রহমান অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করছে নিজের সমস্ত দেহে। বাম হাতখানা তুলে ধরবার চেষ্টা করতেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো কিন্তু একি, তার কণ্ঠ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না কেন?

হাতুড়ির শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট মনে হচ্ছে। একটু আলোর রশ্মিও দেখা যাচ্ছে যেন। রহমান সোজা হবার চেষ্টা করতেই বেশ বুঝতে পারলো তার দেহখানা পাথর স্তূপে চাপা পড়েছে।

ধীরে ধীরে রহমানের স্মরণ হলো সব কথা।

সেই শত্রুপক্ষের লোকটা রিভলভার উদ্যত করে দাঁড়িয়ে ছিলো তার পেছনে, রিভলভারের আগাটা ঠেকে ছিলো তার পিঠে। লোকটা নিশ্চয়ই

তাকে চিনতে পেরেছিলো, বুঝতে পেরেছিলো সে তাদের দলের লোক নয়। তাই সে অকস্মাৎ এসে হাজির হয়েছিলো তার পাশে।

রহমানের সব কথা মনে পড়ছে, কিছু পূর্বেও সে ভাবতে পারেনি তার কি ঘটেছে কিন্তু এখন সব তার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো। তবে কি সেই ভীষণ শব্দটা পাতাল গহ্বরকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করেছে? রহমান আর ভাবতে পারে না, মাথাটা তার ঝিম ঝিম করছে।

পুনরায় সে নিজকে সব ভাবনা থেকে মুক্তি দিলো। নিশ্চুপ রইলো রহমান মৃতদেহের মত অসার হয়ে। এখনও সেই প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দটা তার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

রহমান জীবিত আছে এটা আশ্চর্য লাগছে তার নিজের কাছে। যেভাবে ভূগর্ভে বিস্ফোরণ ঘটলো তাতে তার বেঁচে থাকার কথা নয়।

হাতুড়ির শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে। যখন ক্লান্তি আর অবসাদে রহমান নিস্তেজ হয়ে আসে তখন ঐ হাতুড়ির শব্দ তাকে সজাগ করে তোলে।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেলো।

রহমান আজও সেই পাথর চাপা অবস্থায় রয়েছে। সে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কারণ কবরের জমাট অন্ধকারে তার চার পাশ আচ্ছন্ন।

মৃত্যু তার ঘটেনি কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রহমানের দেহ অবশ হয়ে আসছে। আর কতক্ষণ সে এইভাবে গভীর মাটির তলায় পাথরস্তূপের নিচে চাপা পড়েও জীবনে বেঁচে থাকতে পারে? কেন তার মৃত্যু হলো না? কেন সে জীবিত রইলো আর মৃত্যুকে সে তিল তিল করে অনুভব করছে। হঠাৎ মৃত্যু ঘটলে সে কিছু জানতো না, বুঝতো না। এক সময় তার মৃতদেহটা গলিত লাশে পরিণত হতো তারপর কংকালে রূপান্তরিত.....না না, আর সে ভাবতে পারে না, কারণ মৃত্যু তার হয়নি, এখন হবে এবং তার দেহটা সত্যি সত্যি গলিত লাশে পরিণত হবে, তারপর কংকালে, তারপর একদিন মিশে যাবে গভীর মাটির তলায় তার দেহের শেষ চিহ্ন......

রহমান খুব জোর দিয়ে চিৎকার করে উঠে, যদি কেউ শুনতে পায় সেই আশায়। কিন্তু কই, একটু শব্দও তার কণ্ঠ দিয়ে বের হচ্ছে না।

রহমান আর ভাবতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। হাতুড়ি বা শাবলের আঘাত সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো। এবার সব যেন থেমে গেলো। তার প্রাণের স্পন্দনটাও ক্রমে ঐ শব্দের মত নিশ্চুপ হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে রহমান তলিয়ে যাচ্ছে কোন্ অসীমে...

যখন রহমানের সংজ্ঞা পুনরায় ফিরে এলো তখন সে চোখ মেলেই আলোর রশ্মি দেখতে পেলো। মনে হচ্ছে সে নতুন জীবন লাভ করেছে কিন্তু একি, একচুলও নড়তে পারছে না, গোটা দেহটা এখনও তার পাথরস্তূপের তলদেশে রয়েছে।

উপরের দিকে তাকালো রহমান।

একটু ফাঁক নজরে পড়লো তার।

সেই ফাঁকে পৃথিবীর আলো ভেসে আসছে পাতাল গহ্বরে। রহমান ভীষণভাবে আশ্চর্য হয়ে গেছে, সে এখনও কি করে জীবিত আছে। যে বিস্ফোরণটা ঘটেছিলো তার অন্ততঃপক্ষে কয়েকদিন পূর্বে। তার মৃত্যু ঘটেনি, কারণ মাথা এবং বুকে তার কোনো আঘাত লাগেনি তাই সে জীবিত রয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই।

কি ঐ ফাঁকটা এলো কি করে?

তবে কি সেই শব্দ যেটা হাতুড়ি বা শাবলের আঘাত বলে মনে হচ্ছিলো, সেটাই ঐ ফাঁক সৃষ্টির কারণ?

নিশ্চয়ই তাই হবে।

কোনো উদ্ধারকারীদল বা ঐ ধরনের লোক জানতে পেরেছেন ভূগর্ভে বিস্ফোরণটা ঘটেছে এবং সেখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। হয়তো সে কারণেই তারা উদ্ধারকার্যে লিপ্ত হয়েছে।

রহমান সেই ক্ষীণ আলোকরশ্মির স্বল্প আলোতে নিজ হাতের দিকে তাকালো কিন্তু একি, তার বাম হাতখানা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার দেহ থেকে, সামান্য কিছু চামড়া হাতখানাকে এখনও তার দেহের সঙ্গে সংযোগ করে রেখেছে মাত্র। রহমান শিউরে উঠলো তার বাম হাতখানার অবস্থা লক্ষ্য করে।

সমস্ত মাথাটা রক্তে জমাট বেঁধে আছে তার।

কিন্তু এখনও তো সে জীবনে বেঁচে আছে, কাজেই সে এভাবে মরতে পারে না। বাঁচবার চেষ্টা করে রহমান নিজের দেহখানাকে টেনে বের করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো।

সে বিরাট আকার পাথরগুলো সরিয়ে দেহটাকে টেনে বের করা তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হলো। তবু সে চেষ্টা করতে লাগলো। যদিও অসহ্য যন্ত্রণায় মুখখানা তার বিকৃত হয়ে আসছিলো।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটখানা চেটে নিচ্ছিলো সে বারবার।

ঠিক এমন সময় উপর থেকে ভেসে এলো একটা কণ্ঠস্বর—নিচে কোনো লোক চাপা পড়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

অপর কণ্ঠস্বর—কেমন করে বুঝলি নিচে কোনো লোক চাপা পড়ে আছে?

পূর্বের কণ্ঠস্বর—একটা গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

রহমান সব কথা শুনতে পাচ্ছে কিন্তু কোনো আওয়াজ সে করতে পারছে না। অনেক চেষ্টা করলো রহমান একটু শব্দ করে সাহায্য প্রার্থনা করবে কিন্তু কণ্ঠ একেবারে শুষ্ক।

হঠাৎ একটা ক্ষীণ আশা তার মনে উঁকি দিলো। ওরা যদি এই পাথর স্তূপ সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় তাহলে হয়তো জীবনে বাঁচতে পারে সে।

তারপর কখন আবার সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো খেয়াল নেই রহমানের। চোখ মেললো সে ধীরে ধীরে, প্রথমে স্মরণ হলো সেই অদ্ভুত মেশিনের কথা। যে মেশিনের সাহায্যে রহমান চাঁদের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়েছিলো। অদ্ভুত সে মেশিন, এমন ধরনের মেশিন রহমান পূর্বে কোনোদিন দেখেনি। সেই মেশিনের দ্বারা যে ছবি সে দেখছিলো তা আরও বিস্ময়কর। চাঁদের পিঠে বিরাট বিরাট গর্ত বা কোকড় রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই বিরাট গর্তগুলো যখন তার সম্মুখস্থ পর্দায় লক্ষ্য করছিলো তখন রহমান দেখেছিলো একটি গর্তে বিরাট একটি জীব বা ঐ ধরণের কিছু হবে। তখন রহমান ভাবছিলো চাঁদের পৃষ্ঠদেশেও তাহলে জীব আছে। জীবটা গর্ত থেকে বেরিয়ে উপরে উঠে এলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে তার কাছে রিভলভারের স্পর্শ......

রহমান তাকলো তার চারপাশে।

না, কেউ নেই।

নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার চারদিক।

ভাল করে তাকিয়ে বুঝলো সে ঐ স্থানে ঐভাবেই পাথরচাপা অবস্থায় রয়েছে। তাহলে তার মুক্তি হয়নি, ঐ পাথরখন্ডগুলোর তলদেশেই যে এখনও চাপা পড়ে আছে।

অন্যদিনের চেয়ে আজ সে অনেকটা সুস্থ মনে করলো নিজকে। যদিও সে অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছিলো তবু বাঁচবার একটি স্পৃহা তার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

রহমান দু'হাতে পাথরগুলো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারলো বাম হাতখানা তার সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েছে। একমাত্র ডান হাত দিয়ে সে ভারী পাথরগুলো সরিয়ে ফেলতে লাগলো।

বহুক্ষণ চেষ্টা চালানোর পর কিছুটা হাল্কা হয়ে এলো রহমানের দেহটা। বহু পাথর সে এক হাতেই সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হলো।

এক সময় সমস্ত দেহটা তার বেরিয়ে এলো মুক্ত হয়ে। কিন্তু রহমানের গোটা শরীরটা তখন নেতিয়ে পড়েছে। জমাট রক্তগুলো ঘামে ভিজে লালচে পানির মত নাক কান বেয়ে ঝরতে লাগলো।

রহমান এবার উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু একি, বাম হাতখানা তার ঝুলছে। সামান্য কিছু অংশ মাত্র লেগে রয়েছে দেহের সঙ্গে। চোখমুখে মাথায় চাপ-চাপ রক্ত জমে আছে।

মাথাটা টলছে রহমানের।

বড় দুর্বল।

ক্ষুধা-পিপাসায় কণ্ঠনালী শুষ্ক।

তবু রহমান বাঁচার আশা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। যেমন করে হোক বাঁচতেই হবে। এই মুহূর্তেও মনে পড়লো সর্দার এবং দিপালীর কথা, না জানি তারা কোথায়। বেঁচে আছে না মরে গেছে কে জানে।

মাথার উপরে কিছু অংশ ফাঁকা।

সেই ফাঁকা দিয়ে সামান্য সামান্য আলোকরশ্মি উঁকিঝুঁকি মারছিলো।

রহমান সেই স্বল্প আলোক রশ্মিতে তাকালো নিজ বাম হাতখানার দিকে। ওটা ঝুলছে একটা আলগা বস্তুর মত কতকটা আবর্জনার মতই লাগছে রহমানের কাছে তার নিজের হাতখানাকে।

ওটা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে।

এত দুঃখেও রহমান নিজ বাম হাতের জন্য হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করলো। কিন্তু আফসোস করে কোনো ফল হবে না, ওটা দেহের সঙ্গে থাকলে তার চলাফেরায় অসুবিধা হবে। রহমান অতি কষ্টে বাম হাতখানাকে একটি পাথরের উপর রেখে অপর একটা পাথরখণ্ড দিয়ে আঘাত করলো, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো বাম হাতখানা।

যন্ত্রণায় মুখখানা রহমানের বিকৃত হলো।

কিছুক্ষণ সে মাথাটা দু হাঁটুর মধ্যে গুঁজে অসহ্য যন্ত্রণা চেপে যেতে চেষ্টা করলো।

ঐ মুহূর্তে স্পষ্ট তার কানে গেলো মনুষ্য কণ্ঠস্বর। মনে হলো তার অবস্থান থেকে অনতিদূরেই কারা যেন কথা বলছে। ভালভাবে তাকালো রহমান, যন্ত্রণায় মুখখানা তার বিকৃত। কারণ একটু পূর্বে বাম হাতখানাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে সে। তাজা রক্ত ঝরছে ফিন্‌কি দিয়ে।

অসহ্য যন্ত্রণা।

চিৎকার করে উদ্ধার চাইবে তারও উপায় নেই, কারণ কণ্ঠ শুকিয়ে শুকনো ঠনঠনে কাঠ বনে গেছে যেন জিভখানা ঘসঘসে চামড়ার মত। জিভটা যেন তালুর সঙ্গে আঠালোভাবে সংযোগ হয়ে গেছে।

রহমান একটা বড় পাথরখন্ডের সঙ্গে হেলান দিয়ে ধুঁকছিলো।

ঐ সময় একটা টর্চের আলোর ছটা তীব্রভাবে এসে পড়লো তার সম্মুখস্থ দেয়ালে।

চমকে উঠলো রহমান।

তাহলে কি সত্যি কোনো মানুষ তার কাছাকাছি এসে পড়ছে। হয়তো তাই হবে, নাহলে মানুষের কণ্ঠস্বর কেন তার কানে ভেসে আসবে। আর এই টর্চের আলোই বা এলো কোথা থেকে।

সম্মুখে দৃষ্টি ফেলতেই রহমানের চোখে পড়লো একখানা পা এবং দেহের কিছু অংশ পাথরে চাপা পড়ে আছে তারই একবারে পাশে। রহমান আঁতকে উঠলো না, কারণ তারও অবস্থা যে ঐ রকমই, ভাগ্যিস জীবনে বেঁচে আছে। একটু ভালভাবে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো যার হাত এবং পা নজরে পড়ছে সেই ব্যক্তি হলো ক্যারিলংকোর অনুচর যে তার পিঠে রিভলভার চেপে ধরে ছিলো এবং যার রিভলভারের গুলী ছিটকে গিয়ে সেই অদ্ভুত মিটারে বিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসলীলায় পরিণত হয়েছে ক্যারিলং-এর ভূগর্ভ গোপন আস্তানা এবং তার মূল্যবান মেশিনাদি। সেই ধ্বংসলীলার শিকারে পরিণত হলো সে নিজেও.......

বেশিক্ষণ ভাবার সময় নেই রহমানের। যাদের কণ্ঠস্বর সে শুনতে পাচ্ছে তারা কারা কে জানে—শত্রু পক্ষের লোক হতে পারে। রহমান দ্রুত আত্মগোপন করার জন্য একটি পাথরস্তূপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে ঝুঁকে পড়লো। তাজা লাল রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো পাথরখন্ডগুলো।

টর্চের আলো আরও সরে আসছে।

রহমান স্পষ্ট দেখছে দুটি ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সামনের দিকে।

এরা কারা?

রহমানের মনে প্রশ্ন, যদি ক্যারিলংকোর লোক বা অনুচর হয় তাহলে তাকে ওরা ক্ষমা করবে না বরং হত্যা করবে। আর যদি কোনো রক্ষাকারী দল হয় তাহলে জীবনে বাঁচতে পারে।

রহমানের সম্মুখে এখন মৃত্যু বিভীষিকা। বাম হাতখানা সে চিরদিনের জন্য হারিয়েছে। শুধু কি সে বাম হাতখানাকে হারিয়েছে, হারিয়েছে প্রচুর রক্ত।

হামাগুড়ি দিয়ে লক্ষ্য করছে রহমান, অতিকষ্টে যন্ত্রণাসূচক শব্দকে সে চেপে রেখেছে, কণ্ঠ নালী দিয়ে যেন হঠাৎ কোনো শব্দ বের না হয় সেদিকে রয়েছে লক্ষ্য। রহমানের সম্মুখ দিয়ে দু'জন লোক প্রবেশ করলো, তারা টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগলো চারিদিকে।

ধ্বংসস্তূপের উপর আলো ফেলতেই একজন লোক বলে উঠলো—ঐ দেখো লরেং ওখানে একটি মৃতদেহ, হাত এবং পা দেখা যাচ্ছে।

লরেং নামের লোকটা আরও দু'কদম এগিয়ে গিয়ে দেখলো সেও বলে উঠলো—হাঁ, তাই তো দেখছি। না জানি এই ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও কত জন চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। ঝিংএ, আমরাও যদি ঐ সময় এই ভূগর্ভ আস্তানায় থাকতাম তাহলে আমাদের অবস্থাও ঠিক এই অধমগুলোর মতই হতো।

বললো ঝিংএ—ভাগ্যিস আমরা মালিকের খোঁজে ইলোরায় গিয়েছিলাম তাই রক্ষে।

লরেং বললো—রক্ষে আর কই পেলাম ঝিংএ। সর্বস্ব হারিয়ে আজ আমরা নিঃস্ব। সব তো আমাদের চাপা পড়েছে এই ধ্বংসস্তূপের তলায়।

অত শত ভাবিনে, জীবন রক্ষা পেয়েছে এটাই যথেষ্ট।

এখন তা হলে কি করবো?

করবো আবার কি, এরপর ইলোরায় যাবো, সেখানে গিয়ে এই ধ্বংসলীলার কথা জানাবো, তারপর....

আর এ ধ্বংসস্তূপ পুনরায় গড়া সম্ভব নয়। মালিকের এত সাধের ভূগর্ভ সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলো, বড়ো আফসোস।

ঝিংএর কথায় বললো লরেং—মালিক নিজেই যে উধাও হয়ে গেছেন সেখানে তাঁর সাধনা ধ্বংস হয়ে এমন কি এসে যাবে। একটা আস্তানা ধ্বংস হলো, আরও একটা তো রয়েছে।

ঝিং এ বললো—এখানে যে সব মেশিনাদি ছিলো অন্য কোথাও তা নেই। এমন কি পৃথিবীর কোন স্থানে এই ধরনের মেশিন আছে বা ছিলো কিনা আমরা জানি না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললো লরেং—কি করে যে এমন একটা ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা সংঘটিত হলো ভেবে পাচ্ছি না।

কি করে হলো তা আমি বা তুমি জানিনা। মালিক কোথায় তাও জানি না আমরা। আমার মনে হয় সবকিছুই মালিকের কারসাজি।

মানে?

মানে এতদিন তিনি তার দলবল বা কোম্পানীর লোকজন নিয়ে পৃথিবীর বুকে অনেক ধ্বংসলীলা সংঘটিত করেছেন এবং তিনি তাঁর নিজের কর্মের জন্য অনুশোচনা করে নিজ আস্তানা এবং ধ্বংসকারী মেশিনাদি সব বিনষ্ট করে নিজে হাওয়া হয়ে গেছেন।

কিন্তু তা নয়, মালিক নিজে তাঁর এত সাধনার সম্পদ নষ্ট করতে পারেন না। বিনষ্ট অথবা ধ্বংসলীলার পেছনে আছে গোপন কোনো ষড়যন্ত্র। ঐ যে দু'জন অচেনা অজানা লোক এবং একটি মহিলা যেদিন এই গোপন আস্তানায় এসে উপস্থিত হলো সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছি আমাদের কোম্পানীর পতন ঘটতে আর বেশি বিলম্ব নেই।

হুঁ ঠিক বলেছো ভায়া, আমারও তাই মনে হচ্ছে। ঐ মেয়েটি এবং পুরুষ লোক দু'জন গেলো কোথায়?

কিন্তু তারা যেখানেই যাক বা লুকিয়ে থাক এ মুহূর্তে তারা জীবিত নেই। তাদের মৃত্যু ঘটেছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আচ্ছা ভায়া, আমরা যে আজ ক'দিন থেকে পাথরস্তূপ কেটে কেটে এই ভূগর্ভ তলদেশে এলাম এতে আমাদের কোনো লাভ হলো না। যারা নিচে ছিলো মানে এই গোপন আস্তানায় নানা কাজে ব্যস্ত ছিলো তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছে।

হাঁ, এটা সত্য যে, একজনও এই ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবিত নেই বা থাকতে পারে না।

তাহলে আমরা কি বিফল হয়ে ফিরে যাবো?

তা ছাড়া উপায় কি আছে বলো?

যারা পাথরচাপা পড়ে রইলো...

তারা যুগ যুগ ধরে এখানেই ধ্বংসস্তূপের নিচে 'মমি' হয়ে থাকবে।

চলো তাহলে ফিরে যাই?

এই যে মৃতদেহটা যা আমাদের সম্মুখে রয়েছে সেটা এমনি থাকবে?

কি হবে আর ওর থেতলে যাওয়া দেহটা টেনে হিঁচড়ে বের করে? চলো আমরা দু'জন প্রাণ নিয়ে ফিরে যাই।

রহমান এতক্ষণ অসীম ধৈর্য্যসহকারে চুপ করে শুনে যাচ্ছিলো। যদিও অসহ্য যন্ত্রণায় ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো তার তবু নীরব রইলো, কারণ এরা দু'জন ক্যারিলংয়ের অনুচর তাতে কেনো ভুল নেই। এরা যদি তাকে দেখে ফেলে তাহলে বিপদ অনিবার্য। ধ্বংসলীলায় একখানা হাতই শুধু গেছে, এবার ওদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেলে জীবনটাও যে চলে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সর্দার কোথায় তাকে জানতে হবে। সত্যি কি সর্দার জীবনে বেঁচে আছে না তার বৃথা চিন্তা.....

হঠাৎ চিন্তাধারায় বাধা পড়লো রহমানের। চমকে তাকিয়ে দেখলো ওরা দু'জন ফিরে যাচ্ছে, ওদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। একজন বললো— ধ্বংসস্তূপের নিচে বহু সম্পদ চাপা পড়ে রইলো। যা কোনোদিনই উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

হাঁ, সব শেষ হয়ে গেছে। মালিক মিঃ ক্যারিলং জীবিত আছেন কিনা তাও বলা যায় না, হয়তো বা তাঁরও মৃত্যু ঘটেছে এই ধ্বংসস্তূপের নিচে...

রহমান আর বিলম্ব না করে অতি কষ্টে এগুতে লাগলো। তবে খুব সাবধানে এগুচ্ছে সে। পরিষ্কার পথ নয়, ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে আহত অবস্থায় কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও উঁবু হয়ে এগুতে লাগলো সে। এই মুহূর্তে যদি সে পথ চিনে না নেয় তাহলে আর বেরুবার কোনো আশা তার থাকবে না।

রহমানের অবস্থা এখন এত কাহিল যে, একটু এগুতেই সে বেশ হাঁপিয়ে পড়ছিলো। কদিনের ক্ষুধার্ত সে, পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তবুও মরিয়া হয়ে এগুচ্ছে।

কিছুটা এগিয়েই সম্মুখস্থ লোক দু'জন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারা কেন থমকে দাঁড়ালো বুঝতেই পারলো রহমান। পথ অত্যন্ত দুর্গম সেই

স্থানে, কয়েকটা মৃতদেহ পড়ে আছে, স্তূপের তল থেকে হাত পা মাথা এবং দেহের কিছু কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

লোক দু'জন ওদের মৃতদেহ টেনে বের করার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না তখন পা বাড়ালো সেখান থেকে সামনের দিকে।

রহমানও তাদের দু'জনকে অনুসরণ করলো।

হঠাৎ একটা পাথরে পা পড়ায় পাথরখানা গড়িয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হলো একটা।

লোক দু'জন থমকে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেললো। রহমান ততক্ষণে উঁবু হয়ে শুয়ে পড়েছে।

টর্চের আলোকটা রহমানের দেহের উপর দিয়ে চলে গেলো বার কয়েক ঘুরপাক খেয়ে। রহমানের চোখেমুখেও আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়লো কিন্তু তার ভাগ্য বলতে হবে তাই তাকে ওরা দেখতে পেলো না।

ওরা শব্দ শুনে একটু ভয় পেয়ে যায় যেন। মনে করেছে হয়তো বা মৃতদেহগুলো নড়ে উঠেছে। ওরা পা বাড়ালো দ্রুতগতিতে। একটু আধটু ফাঁক কোথাও বা একেবারে পথ রোধ হয়ে গেছে, অনেক কষ্টে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

রহমানও অতি কষ্টে এবং সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছে।

কোথাও সোজা সরল পথ নেই।

কোথাও ছাদ ধসে পড়ে পথরোধ হয়েছে। আবার কোথাও বা দেওয়াল ভেঙে পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। এসব ডিংগিয়ে অগ্রসর হওয়া কম কথা নয়। ওরা দু'জন সুস্থ সবল লোক তাই ওদের তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। রহমান আহতই শুধু নয়, তার দেহ থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে—একখানা হাতও সে হারিয়েছে। তারপর সে ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত, কাজেই ওদের দু'জনকে অনুসরণ করে এগুনো সম্ভব হচ্ছে না।

তবু তাকে বাঁচার তাগিদে এগুতে হচ্ছে।

হঠাৎ সম্মুখে বেশ স্পষ্ট আলো পরিলক্ষিত হলো। ইলেকট্রিক আলো নয় সূর্যের আলো। রহমানের মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। লোক দু'জন তার শত্রুপক্ষের হলেও এ মুহূর্তে বন্ধু বলে মনে হচ্ছিলো, কারণ সেই যে পাথর ভাঙার হাতুড়ির শব্দ ভেসে আসছিলো এটা এদেরই শাবলের আঘাত বা হাতুড়ির শব্দ। এরা পথ করে নিয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করেছে এবং নিচে ধসে

পড়া ধ্বংসস্তূপের তলায় কিভাবে সবকিছু বিনষ্ট হয়েছে তাই তারা দেখবার জন্যই প্রবেশ করেছিলো বলে মনে হলো রহমানের।

পাথর আর ইটের স্তূপ অতিক্রম করে ওরা বেরিয়ে গেলো। ওদের কণ্ঠস্বর আর শোনা যাচ্ছে না।

রহমান একটা পাথরখন্ডে বসে হাঁপাতে লাগলো। কোনো ক্রমেই যেন সে এগুতে পারছিলো না। একবিন্দু পানি এ দন্ডে তার কাছে অমৃত সম মনে হচ্ছে কিন্তু পানি সে কোথায় পাবে।

ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকালো রহমান উপরের দিকে। যেদিক থেকে সূর্যের আলোর ছটা ভিতরে প্রবেশ করছিলো।

কিছুক্ষণ বসে জিরিয়ে নিলো রহমান তারপর উঠে দাঁড়ালো, যেমন করে হোক এই ধ্বংসস্তূপ থেকে তাকে বেরুতেই হবে। পথ যখন আপনা আপনি পেয়ে গেছে তখন এভাবে বদ্ধ পাতাল গহ্বরে মৃত্যুবরণ করবে না সে। নাইবা রইলো তার বাম হাতখানা, তবু জীবন নিয়ে ফিরে যাবে সে আস্তানায়। হঠাৎ এই মুহূর্তে ভেসে উঠলো তার মনে ফুল্লরার কথা। মেয়েটাকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেলো। না জানি সে কোথায় আছে কেমন আছে। জীবিত আছে না মরে গেছে তাই বা কে জানে।

চরম দুঃখের সময় কন্যা ফুল্লরার ফুলের মত মুখখানা চোখের সামনে ভাসতে লাগলো রহমানে। দু'চোখ ভরে পানি এসে গেলো, কিন্তু এখন দুঃখ বা ব্যথা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই।

উঠে দাঁড়ালো রহমান।

পাথর আর ইটের স্তূপ সরিয়ে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চললো।

যখন সে ধ্বংস স্তূপ থেকে বেরিয়ে এলো তখন সূর্য ডুবে গেছে। আকাশে ভরে উঠেছে তারার মালা।

রহমান মুক্ত আকাশের নিচে স্বচ্ছ বাতাসের তলে দাঁড়িয়ে ধুকতে লাগলো। বেশিক্ষণ দাঁড়াবার মত শক্তি ছিলো না। মাতালের মত পা দু'খানা তার টলছে।

ধক ধক করছে তার বুকটা।

বসে পড়লো রহমান, এটা কোন্ জায়গা কে জানে।

এক কলসী পানি পেলে এই দন্ডে রহমান পিপাসা মিটিয়ে পান করতো কিন্তু সে আশা সফল হবার নয়। নিরাশ হৃদয়ে ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকালো

সে আকাশের দিকে। জায়গাটা যে শহর বন্দর নয় বেশ বুঝতে পারলো। মাথার উপরে তারাভরা আকাশ।

নীরবে চোখ বুজলো রহমান।

অজানা কোনো একটা পাখি মাথার উপর দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে উড়ে গেলো। হয়তো বা নিশাচর পাখি হবে।

❑

দিপালী কোচড় ভরে তুলে নিয়েছে অদ্ভুত অপূর্ব সুন্দর পাথরগুলো। বারবার সে কোচড়ের দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো, এত আনন্দিত সে কোনোদিন হয়নি!

এক সময় বনহুর আর দিপালী এসে পড়লো সেই সুন্দর ঝকমকে রাজপ্রাসাদ সমতুল্য বাড়িখানার সম্মুখে। বাড়ি ঠিক বলা যায় না, আমাদের দেশের উই এর ঢিবি বা বাসার মত দেখতে সেই প্রাসাদখানা।

দরজার কোনো কপাট নেই।

কোনো প্রহরী নেই।

মুক্ত দরজা।

বনহুর আর দিপালী বিস্ময়ভরা চোখে দেখছে। এত সুন্দর মনোরম প্রসাদ তারা কোনোদিনই দেখেনি। সমস্ত প্রাসাদটা মণিমুক্তাখচিত ঝকমক।

বনহুর আর দিপালী এগিয়ে চলেছে।

তাদের দৃষ্টি যেন এদিক থেকে সেদিক করতে পারছে না। দেয়ালগুলো যে পাথর দিয়ে তৈরি তা পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন চোখেও দেখেনি।

বনহুর আর দিপালী প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে অবাক হয়ে গেছে। ভিতরেও কোনো জনপ্রাণী নেই। স্নিগ্ধ আলোর বন্যায় চারিদিক আলোকিত।

বনহুর বললো—অপূর্ব এ দেশ!

হাঁ, ঠিক বলেছেন রাজকুমার, অপূর্বই বটে। এতবড় প্রাসাদ কিন্তু জনপ্রাণী নেই কেন?

আমি নিজেও তাই ভাবছি।

চলুন রাজকুমার, আরও ভিতরে যাই।

চলো। এসেছি যখন তখন এই অদ্ভুত রাজ্যের অপূর্ব সমাবেশ..হঠাৎ থেমে গেলো বনহুর।

দিপালী তার মুখে ডান হাতখানা চাপা দেয়। তারপর বললো—ঐ দেখুন একজন বৃদ্ধ লোক...

বৃদ্ধ লোক! অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর।

অবশ্য, অবাক হবার কথাই কারণ এ রাজ্যে আমার পর একটিও বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা তাদের নজরে পড়েনি। তারা ভাবতেও পারেনি এ দেশে কোনো বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা আছে।

বনহুর তাকিয়ে অবাক হলো, দেখলো একজন বৃদ্ধ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

বৃদ্ধা তাদের দু'জনকে দেখতে পেরেছে।

ভারী সুন্দর তার চেহারা। সুন্দর দুটি চোখ, একমাথা রেশমী চুল, মুখে সাদা ধবধবে রেশমী দাড়ি।

বনহুর আর দিপালী এগুচ্ছে।

বৃদ্ধও এগুচ্ছে তাদের দিকে। চোখেমুখে তার দীপ্ত উজ্জ্বল ভাব। ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধের দু'চোখের ভ্রু জোড়াও সাদা হয়ে গেছে। তবু বেশ শক্ত-সমর্থ লাগছে তাকে।

বনহুর আর দিপালী প্রথমে বিস্মিত হয়ে পড়েছিলো এখন বৃদ্ধের মুখোভাব লক্ষ্য করে তাদের মুখমন্ডলও সচ্ছ হয়ে এসেছে। তারা দ্বিধাহীন ভাবে অগ্রসর হয়ে এসে দাঁড়ালো বৃদ্ধের সম্মুখে।

বৃদ্ধও এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে তাদের দু'জনের সামনাসামনি।

তিন জনের ছয় চক্ষুর দৃষ্টি বিনিময় হলো।

কিছুক্ষণ নীরব তিনজন।

বৃদ্ধই কথা বললো তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে। কি যে বললো বুঝতে পারলো না বনহুর আর দিপালী। তারা শুধু অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো।

বৃদ্ধ যেন মানুষ নয়, কোন অশরীরী আত্মা। ধব ধবে সাদা চেহারা, ধব ধবে সাদা দাড়ি এমন কি ভ্রু জোড়াও সাদা ধবধবে।

অবাক চোখে বনহুর আর দিপালী তাকিয়ে আছে বৃদ্ধের দিকে। বনহুর ভাবছে এমন বৃদ্ধ সে কোনোদিন দেখেনি। তার চেহারা বৃদ্ধ হলেও বিস্ময়কর বটে। না জানি এই বৃদ্ধের বয়স কত হবে ঠিক নির্ণয় করা মুস্কিল।

বৃদ্ধ ওদের দু'জনকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে মৃদু হাসলো, তারপর সে হাত দিয়ে সম্মুখে ইঙ্গিত করে কিছু বললো।

দিপালী না বুঝলেও বনহুর বুঝলো বৃদ্ধ তাদের ভিতরে যাবার জন্য বলছে।

বনহুর দিপালীকে সঙ্গে করে বৃদ্ধের সঙ্গে রাজ প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগলো।

যতই এগুচ্ছে ততই বনহুর আর দিপালী অভিভূত হতবাক হয়ে যাচ্ছে। এত সুন্দর প্রাসাদ কোনোদিন দেখেনি তারা।

এক সময় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো বৃদ্ধ একটা সিংহাসনের পাশে ঠিক কতকটা পৃথিবীর মানুষের তৈরি সিংহাসনের মতই দেখতে।

বৃদ্ধ বসে পড়লো সিংহাসনে।

সম্মুখে কয়েকটি আসন মত। বৃদ্ধ সেই আসনের দিকে ইংগিত করে বোধ হয় বসতে বললো।

বনহুর দিপালীকে লক্ষ্য করে বললো—বসো দিপালী, বৃদ্ধ আমাদের আসন গ্রহণ করার জন্য ইংগিত করছে।

দিপালী বসলো।

বনহুরও বসলো অপর আসন আকৃতি মেঝের সেই স্থানটিতে। ঠিক যেন মণি-মুক্তা খচিত আসনে। ভারী আরামদায়ক শীতল মেঝেটা।

বৃদ্ধ এবার বনহুর আর দিপালীকে লক্ষ্য করে কিছু বললো।

একবর্ণও বুঝতে পারলো না বনহুর এবং দিপালী। তারা হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে শুনতে লাগলো শুধু।

বৃদ্ধটিকে বনহুর লক্ষ্য করছিলো, লক্ষ্য করছিলো তার কথাবার্তা। বৃদ্ধের বয়স কত জানে না বনহুর তবু আন্দাজ করে নিলো কমপক্ষে হাজার বছরের কম হবে না, অথবা তার বেশিও হতে পারে। কথাগুলো ভারী মিষ্টি, ভারী সুন্দর। পরিধেয় বসন অতি হালকা এবং নরম। দুধে আলতা গায়ের রং। চোখ দুটো গাঢ় নীল না হলেও দীপ্ত।

বৃদ্ধটা বলছে তা কিছুই অনুধাবন করতে পারছে না বনহুর এবং দিপালী তাই কোনো জবাবও তারা দিতে সক্ষম হচ্ছে না। আর জবাব দিলেই বা কি বুঝবে, বৃদ্ধ মোটেই যে বুঝবে না, তাই বনহুর নীরব রইলো। কিন্তু মনে মনে সে ভাবছে যেমন করে হোক এদের কথা বুঝতে হবে এবং তাদের কথাও এদের বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে। আর কোনোদিন তারা পৃথিবীর

বুকে ফিরে যেতে সক্ষম হবে কিনা কে জানে। এই স্বপ্নময় রাজ্য থেকে কারও ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না সত্য, কারণ এমন দেশ তারা কোথাও দেখেনি। হাল্কা দেহ, হাল্কা মন, সুন্দর অপরূপ চোখ ঝলসানো চারিদিকের দৃশ্যগুলো, হাল্কা বেগুনি ফলফুলের সমারোহ....অপূর্ব এদেশ......

বনহুর যখন ভাবছিলো তখন বৃদ্ধ হাতে দু'বার তালি দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন তরুণী সোনার থালায় প্রচুর ফলমূল এবং দু'টি সুন্দর পাত্রে কিছু পানীয় এনে রাখলো তাদের সম্মুখে।

বনহুর আর দিপালীর পেটে ক্ষুধা ছিলো তারা ইচ্ছা করলে গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করতে পারতো কিন্তু বনহুর বললো—দিপালী, যতক্ষণ বৃদ্ধ আমাদেরকে খাবার জন্য না বলবে ততক্ষণ আমরা খাবো না। এতে আমরা তার কিছু কথা জেনে নেবো বা বুঝে নেবো।

বৃদ্ধ কিন্তু বনহুর আর দিপালীর কথাবার্তা সব শুনছিলো অথচ সে একবর্ণ বুঝতে পারছিলো না। দিপালী আর বনহুর যখন সম্মুখস্থ থালায় হাত দিচ্ছিলো না তখন বৃদ্ধ বনহুর আর দিপালীকে লক্ষ্য করে বললো—লুমাম।

অদ্ভুত সে সুর, যেন সঙ্গীতের ঝংকার।

বনহুর বললো—দিপালী, লুমাম মানে নাও অথবা খাও।

বনহুরকে লুমাম শব্দ উচ্চারণ করতে দেখে বৃদ্ধ খুশি হলো এবং সে পুনরায় উচ্চারণ করলো মিমো লুমাম......

বনহুর হেসে দিপালীকে বললো—মিমো লুমাম মানে তোমরা খাও।

বৃদ্ধ খুশি হয়েছে, তার কথাগুলো বনহুরকে উচ্চারণ করতে দেখে বড় আনন্দিত সে।

বনহুর আর দিপালী খেতে শুরু করলো।

বনহুর বললো—খবরদার পানিতে হাত দেবে না। ওটা পান করলে সংজ্ঞা থাকবে না।

দিপালী কোনো কথা বললো না শুধু মাথা নেড়ে জানালো সে ঐ পানিতে হাত দেবে না। ইতিপূর্বে ঐ ধরনের পানিয় পান করে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলো বনহুর এবং দিপালী।

বৃদ্ধ এবার সম্মুখে দন্ডায়মান তরুণীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললো মিশাম।

বৃদ্ধের কণ্ঠ থেকে কথাটা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে তরুণীদ্বয় চলে গেলো। যাবার সময় মাথা নীচু করে ঠিক পৃথিবীর মানুষের কায়দায় অভিবাদন জানালো বৃদ্ধকে।

বনহুর বললো—মিশাম মানে খাও, বুঝলে দিপালী...

হাঁ রাজকুমার, এখন বুঝতে পারছি।

তাহলে আমরা কদিনেই অনেক কথার মানে বুঝে নেবো।

আমার মনে হয়....

দিপালীর কথার মাঝে বলে উঠলো বৃদ্ধ—লুমাম, লুমাম...

বনহুর বললো—খাচ্ছি...হাত দিয়ে মুখে ফল তুলে দিয়ে বৃদ্ধকেও সে তার ভাষা বুঝাতে চেষ্টা করলো।

বৃদ্ধ বললো—জুমা, জুমা লিমাশো...

বনহুর একবর্ণও বুঝলো না।

তারা খেতে লাগলো তবে এটুকু আন্দাজ করলো বৃদ্ধ তাদের তাড়াতাড়ি খেতে বলছে।

বনহুর আর দিপালীর খাওয়া শেষ হলো।

ফল খেতে ভালবাসে বনহুর, প্রাণভরে সে ফল খেলো।

দিপালীও কম খেলো না।

তারা উভয়ে ফল খেয়ে পরম তৃপ্তি অনুভব করলো। মনে হলো এত তৃপ্ত বুঝি তারা কোনোদিনই হয়নি। বনহুর ইচ্ছা করছিলো একটু ঘুমিয়ে নিতে কিন্তু সে উপায় কোথায়। বৃদ্ধ তাদের লক্ষ্য করে কিছু বললো, তারপর সে নিজে উঠে দাঁড়ালো।

বনহুর আর দিপালীও উঠে দাঁড়ালো।

ভারী ভাল লাগছে।

খুব ফূর্তি লাগছে বনহুরের।

বললো বনহুর—ভেবেছিলাম বৃদ্ধ আমাদের জন্য নতুন কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করার কিন্তু অদ্ভুত এ দেশ আর অদ্ভুত এ দেশের মানুষ। সত্যি দিপালী, এরা কোনোদিন কারও সঙ্গে অসৎ আচরণ করতে জানে না। অপরূপ এক রাজ্য এটা। পৃথিবীর মানুষ আমরা শুধু হিংসাবিদ্বেষ আর অন্যায় অনাচার নিয়ে থাকতে ভালবাসি আর এরা কত সুন্দর, কত মধুর—রাগ-অভিমান ব্যথা-বেদনা এদের স্পর্শ করতে পারে না।

বৃদ্ধ আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে।

যেন অতিথিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন কোনো মহামানব। চলতে চলতেই কথা হচ্ছিলো বনহুর আর দিপালীর মধ্যে।

দিপালীর ভারী আনন্দ হচ্ছে। চোখেমুখে তার ফুটে উঠেছে এক অনাবিল খুশির উচ্ছ্বাস।

বৃদ্ধ ছাড়া এ রাজ প্রাসাদে আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। দু'জন তরুণী যারা তাদের খাবার নিয়ে কিছু পূর্বে হাজির হয়েছিলো এ মুহূর্তে তাদেরকেও দেখা যাচ্ছে না।

অপরূপ রাজপ্রাসাদ।

উপরে ছাদ বা কোনো আবরণ নেই। একটা সুন্দর স্নিগ্ধ আলোর বন্যায় ঝলমল করছে চারিদিক; এমন কি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরেও রঙের খেলা।

বৃদ্ধ যেন তাদের কত পরিচিত কত আপনজন। মাঝে মাঝে সে ফিরে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো তারা আসছে কিনা। বনহুর বললো—দিপালী, একটা জিনিস লক্ষ্য করছো?

ততক্ষণে বৃদ্ধ একটি সুন্দর কক্ষের সম্মুখে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। কক্ষের দরজা মুক্ত ছিলো, বৃদ্ধ ইংগিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করতে বললো, শব্দটা হলো আসফানুলুমা।

বনহুর আর দিপালী থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পুনরায় বৃদ্ধ উচ্চারণ করলো—আসফানুলুমা।

বনহুর এবার দিপালীকে লক্ষ্য করে বললো—চলো, বৃদ্ধ আমাদের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য বলছেন।

দিপালী আর বনহুর বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালো।

বৃদ্ধ মৃদু হেসে ইংগিত করলো প্রবেশ করার জন্য।

বনহুর ভিতরে প্রবেশ করলো।

দিপালী তাকে অনুসরণ না করে পারলো না। সুন্দর মনোরম কক্ষ। দেয়াল তো নয় যেন তারা দিয়ে তৈরি প্রাচীরের স্তর। অপূর্ব সুন্দর গৃহশয্যা।

দিপালীর দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর, বললো—বৃদ্ধ মনে করেছে আমরা উভয়ে...কথাটা শেষ না করেই হাসলো সে একটু শব্দ করে।

দিপালী মাথাটা লজ্জায় নত করে নিলো।

ততক্ষণে বৃদ্ধ দরজার পাশ থেকে চলে গেছে।

সুন্দর শয্যা।

কতকটা পৃথিবীর মানুষের ব্যবহারযোগ্য শয্যার মই দেখতে। মাঝে একটি গোল টেবিলের মত সোনার তৈরি সৌধ। তার উপরে মূল্যবান

কয়েকটি পাথর। সেই পাথরগুলো থেকে আলোর ছটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

বনহুর বললো—দিপালী, তুমি খুব ক্লান্ত, এই বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ো।

রাজকুমার, আমি আপনার দাসী সমতুল্যা, এই মেঝেতেই আমি ঘুমোতো পারবো, আপনি শয্যা গ্রহণ করুন।

হাসলো বনহুর।

দিপালী বললো—একদিন আপনাকে আমি বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু এখন সে সাহস আমার নেই। ...

দিপালী, তুমি তো জানো আমার কাছে সবাই সমান। মানুষ আমার কাছে মানুষের অধিকার পাবে। কেউ আমার কাছে হীন বা নগণ্য নয়। তুমিও তাই...যাও শুয়ে।

দিপালী এবার অমত করতে পারলো না, সে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। তার আঁচলে পথ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া পাথরগুলো তখনও ছিলো।

এবার পাথরগুলো আঁচল থেকে টেবিল বা সৌধটার উপরে রাখলো।

বনহুর ততক্ষণে সুন্দর কারুকার্যখচিত মেঝেতে দেহটা এলিয়ে দিলো।

তারপর কখন যে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো বনহুরের। সে উঠে বসে তাকালো শয্যার দিকে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে দিপালী।

শুভ্র রজনীগন্ধার মত লাগছে তাকে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না বনহুর। দিপালীকে সে বহুদিন দেখেছে কিন্তু এমন করে সে যেন কোনোদিন দেখেনি।

এই সৌরজগতে আসার পর অপূর্ব অপরূপ নারী যে বহু দেখেছে কিন্তু দিপালী আর তাদের মধ্যে যেন আলাদা একটা রূপ লক্ষ্য করেছে। এ রাজ্যের নারীগণ মোমের পুতুলের মত সুন্দর, অপরূপ কিন্তু দিপালীর মত সজীব নয়।

বনহুর মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যাচ্ছিলো দিপালীর দিকে।

দিপালী নিদ্রায় অচেতন।

তার মুখমন্ডল ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

বনহুর নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এমন সময় একটা সঙ্গীতের সুর ভেসে এলো তার কানে। ভারী সুন্দর এবং মিষ্টি সে সুর।

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো বনহুর বাইরের দরজার দিকে। সুরটা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর থেকেই আসছে। এমন সুর বনহুর কোনোদিন শোনেনি। নিদ্রামগ্ন দিপালীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো বনহুর, তারপর বেরিয়ে এলো সে হালকা মেঘের মত সচ্ছভাবে।

এগুতে লাগলো সে সুর লক্ষ্য করে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলো বনহুর তা সে জানে না। হয়তো বা এক ঘন্টা হতে পারে, হতে পারে একদিন। কিংবা এক সপ্তাহও হতে পারে।

সেই বৃদ্ধ কোথায়?

বনহুর কিছু ক্ষুধা অনুভব করছে, তবে খুব বেশি নয়!

নিস্তব্ধ পুরীর মত নীরব চারদিক। শুধু দূর থেকে মোহময় সুর ভেসে আসছে। সেই সুর লক্ষ্য করে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত এগুচ্ছে বনহুর।

সম্মুখে বিরাট এক বেলকুনি ধরনের জায়গা।

বনহুর বেলকুনিতে এসে দাঁড়াতেই দেখলো একটি মঞ্চের মত জায়গা, তার উপরে পাশাপাশি বসে আছে কয়েকটি দেব সমতুল্য বৃদ্ধ। তারা সবাই চোখ বন্ধ করে বসে আছে।

সবার চেহারাই অপূর্ব।

বনহুর আরও দেখতে পেলো সেই বৃদ্ধ বসে আছে সর্বোচ্চ আসনে, যে বৃদ্ধ তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলো এবং ফল খেতে দিয়েছিলো। সৌম্যসুন্দর ফেরেস্তা বা দেবতার মত নির্মল পবিত্র তার মুখমন্ডল।

এখানে যতগুলো বৃদ্ধ তার নজরে পড়ছে সবার চেহারাই অপরূপ বলা যায়। বৃদ্ধ অথচ সৌন্দর্যের প্রতীক যেন—ফিকে সোনালী এক একজনের গায়ের রং, যেন দুধে আলতা মেশানো।

বনহুর একনজরেই গুণে নিলো মঞ্চে বা বেদীর উপরে যারা বসে আছে তারা সংখ্যায় আটজন মাত্র।

বেদীর নিচে এক তরুণী বীণা বাজিয়ে চলছে। অদ্ভুত তার সুর।

সুরের মূর্ছনায় রাজপ্রসাদ যেন মোহময় হয়ে উঠেছে।

বৃদ্ধগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত দু'চোখ মুদে মাথা দোলাচ্ছে।

বনহুর নির্বাক নয়নে আড়ালে আত্মগোপন করে এ দৃশ্য দেখছিলো। পৃথিবীর বুকে সে এমন দৃশ্য কোনোদিন উপভোগ করেনি। বনহুর হতবাক, নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে আছে কতকটা সম্বিৎহারার মত।

বনহুর বুঝতে পারে এই রাজ্যের মানুষ সহজে বৃদ্ধ হয় না। হাজার বছরের বেশি এরা বাঁচে। যারা বৃদ্ধ হয় তারা এই রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে বসবাস করে যেন তাদের কোনোরকম কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, সেজন্যই এই সুন্দর মনোরম অপরূপ প্রাসাদ।

বনহুর যখন এসব ভাবছে তখন সে লক্ষ্য করলো বেশ কয়েকজন বৃদ্ধা দলবদ্ধভাবে সেখানে এগিয়ে এলো। তারা আসতেই বৃদ্ধগণ উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজ নিজ পাশে বসালো।

শুধু সেই বৃদ্ধের পাশে কোন বৃদ্ধ উপবেশন করলো না। হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখে সেই বৃদ্ধ সবাইকে বসার জন্য ইংগিত করলো।

যে তরুণী বীণায় ঝংকার তুলছিলো, সে পূর্বের মতই বীণা বাজিয়ে চললো।

বৃদ্ধগণ এক এক করে সবাই ডান হাতখানা দ্বারা তরুণীর চিবুক স্পর্শ করে আসন ত্যাগ করলো।

বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করছে।

ওরা কথা খুব কম বলছে।

বনহুরের মনে পড়লো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, কথা যারা বেশি বলে আয়ু তাদের কমে যায়, আর কথা যারা কম বলে তাদের আয়ু নাকি অনেক বেড়ে যায়। এই সৌরজগতের অপরূপ রাজ্যে সে বেশ কিছুদিন হলো এসে পড়েছে। তাতে তার যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তাতে সে অনেক কিছুই বুঝতে পারছে এবং বুঝেছে। সৌরজগতের এটা কোন্ গ্রহ তা সে জানে না ঠিক তবে যতদূর মনে হয় এটা মঙ্গলগ্রহ হবে।

বনহুর যা ভাবছে তাই সত্য।

এটা মঙ্গল গ্রহই বটে।

মঙ্গল গ্রহ ছাড়াও আরও কোনো কোনো গ্রহে প্রাণী বা জীব বসবাস করে। মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর মতই আলো-বাতাস রয়েছে কিন্তু একেবারে স্বাভাবিক নয়। এখানে সূর্যের প্রখরতা নেই। একটা স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। পৃথিবীর মতই বৃক্ষলতাগুলো। অবশ্য সূর্যের প্রখরতা নেই বলে বৃক্ষলতাগুলোর রং সবুজ নয়, ফিকা বেগুনী। ফুলগুলো

সুন্দর কিন্তু ফিকা বেগুনী। স্থানে স্থানে তৃণ বা ঘাস নজরে পড়ে অথচ ঘাস বা তৃণ তাও ফিকা বেগুনী।

দু'চারটে পাখি নজরে পড়েছিলো বনহুরের তাও নিতান্ত কম। ভারী সুন্দর পাখিগুলোর পালকের রং। তবে পশু বা চতুষ্পদ জন্তু এখনও নজরে পড়েনি তার। বনহুরের বিস্ময় কম নয়, অদ্ভুত এ রাজ্য।

বনহুর এর পূর্বে জানতো না পৃথিবী ছাড়া অপর কোনো গ্রহে মানুষ বসবাস করছে বা আছে। এটা যে মঙ্গল গ্রহ বনহুর তা বেশ বুঝতে পেরেছে এবং ভাগ্যক্রমে সেই মঙ্গল গ্রহে এসে পৌঁছে গেছে সে।

চাঁদের পিঠে মানুষ অবতরণ করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে কিন্তু সৌরজগতে অন্যান্য গ্রহে এখনও মানুষ পৌঁছতে পারেনি। কোন গ্রহে জীব বা বৃক্ষলতাগুলো আছে তাও কেউ জানে না।

সৌরজগত এক বিস্ময়কর স্থান।

চারিদিকে শুধু রঙের আলপনা। না জানি তার মধ্যে রয়েছে কোন্ রহস্য!

বনহুর অবাক হয়ে এসব ভাবছিলো, মঙ্গল গ্রহে সে উপস্থিত হয়েছে। যদি সে আর কোনো দিন পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে না পারে তবু দুঃখ নেই। শুধু আফসোস, পৃথিবীর কেউ জানলো না সে আর দিপালী কোথায়......হঠাৎ বনহুরের সম্বিৎ ফিরে এলো একটা বিস্ময়কর শব্দ ভেসে আসছে তার কানে।

তরুণীর হাতে বীণার ঝংকার থেমে গেলো।

সবাই উপরের দিকে তাকালো।

বৃদ্ধা আর বৃদ্ধা সবার মুখে আনন্দোচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে। তারা আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছে উপরের দিকে।

উপরে কোনো ছাদ নেই, কাজেই সৌরজগতের অপরূপ রঙের খেলা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়! বনহুরও তাকিয়ে আছে, শব্দটা উপরদিক থেকেই আসছে।

মাত্র কয়েক মিনিট।

একটা গোলাকার আলোকরশ্মি সৌরজগত ভেদ করে মাথার উপর এসে পড়েছে। অদ্ভুত সে আলোকরশ্মি, চক্ষু স্থির হয়ে গেলো বনহুরের।

গোলাকার বস্তুটি ধীরে ধীরে প্রাসাদের ছাদের তলদেশে নেমে আসছে। এত বড় প্রাসাদ যে তার মধ্যে একটি যান অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।

যানটা এসে প্রশস্ত মেঝের মাঝখানে নেমে পড়লো। যেন হাল্কা পাখা মেলে নেমে পড়লো একটা ঈগল পাখি। বড় মনোরম সুন্দর যানটি তো মনে মনে ভাবলো বনহুর।

অদ্ভুত যানটি নেমে পড়তেই একটি হালকা দরজা খুলে গেলো।

ভিতর থেকে নেমে এলো অপূর্ব সুন্দর বেশে সজ্জিত এক তরুণ।

তরুণ যান থেকে নেমে পড়তেই আরও দু'জন (সৌরজগতের মানুষই হবে) নেমে পড়লো যান থেকে নিচে।

তরুণ এগিয়ে এসে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাগণকে নত মস্তকে অভিবাদন জানালো।

তাঁরাও হাত তুলে আশীর্বাদ জানালো তরুণকে।

দু'জন বৃদ্ধ তরুণের দু'পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর হাত ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো তরুণীর পাশে।

ততক্ষণে তরুণী উঠে দাঁড়িয়েছে।

যেমন তরুণীর পাশে তরুণটি এসে দাঁড়ালো, অমনি বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাগণ তাদের সম্মুখে এসে হাত তুলে কিছু উচ্চারণ করতে লাগলো।

সম্মুখস্থ বৃদ্ধ বনহুর আর দিপালীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলো, পাশে এসে দাঁড়ালো প্রহরীর মত।

বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাগণ একসঙ্গে কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করলো।

অমনি তরুণ-তরুণী উভয়ে নতজানু হয়ে প্রণাম জানালো বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণকে। তারপর বীণা বা বাদ্যযন্ত্রটি মাটিতে রেখে দু'জন সেই থেমে থাকা উড়ন্ত যানটির দিকে অগ্রসর হলো।

বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাগণ হাত তুলে আশীর্বাদ জানাতে লাগলো।

উড়ন্ত যানটিতে উঠে বসলো তরুণী এবং তরুণটি। সঙ্গে সঙ্গে তরুণের সঙ্গীদ্বয়ও উঠে বসলো। তারাই যান চালনা করছিলো বলে মনে হলো বনহুরের।

যখন তরুণ এবং তরুণী নতজানু হয়ে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাগণকে অভিবাদন জানাচ্ছিলো এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ হাত তুলে আশীর্বাদ করছিলেন তখন বনহুর

সবার দৃষ্টি এগিয়ে সেই বিস্ময়কর যানটির মধ্যে প্রবেশ করলো যানের পেছন দিক দিয়ে।

যানটির ভিতরে প্রবেশ করে দেখলো বনহুর নতুন এক সৃষ্টি এমন ধরনের যান সে কোনোদিন দেখেনি। কলকব্জা বলতেই নেই, সব যেন কেমন অদ্ভুত ধরনের জিনিস। চালক বসার আসনের সম্মুখে চ্যাপটা চাকতি ধরনের কয়েকটা বস্তু রয়েছে। বসবার আসন বলতে চাপ চাপ তুলো বা ঐ ধরনের কিছু রয়েছে। একটা তীব্র আলোর ছটা বের হচ্ছে আসনগুলোর তলদেশ থেকে।

বনহুর আসনগুলো দ্রুত নেড়েচেড়ে দেখলো। নরম তুলতুলে কোনো বস্তু দিয়ে তৈরি। সে ক্ষিপ্রগতিতে একটি আসনের তলদেশে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়লো।

আসনগুলোর পেছন দিকে ছিলো ঝাপসা অন্ধকার, তাই বনহুরকে কেউ দেখতে পেলো না।

তরুণ-তরুণী এসে যানটিতে আরোহণ করলো।

যানটির চালকদ্বয় এসে বসলো তাদের আসনে।

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাগণ হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলো।

চালকদের একজন একটি চাকতির উপরে চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে একটি নীলাভো বালব জ্বলে উঠলো, অমনি যানটি ভেসে উঠলো শূন্যে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড, যানটি বেরিয়ে গেলো উল্কাবেগে প্রাসাদের ছাদ পেরিয়ে বাইরে।

বনহুরের দৃষ্টি চালকদ্বয়ের দিকে।

সে ভালভাবে খেয়াল করছিলো যানটির চালনা কেমনভাবে হয়। লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো যানটি একজন চালনা করছে, অপর জন নিশ্চুপ বসে আছে তার পাশে। হয়তো বা কোনো প্রয়োজনবোধে দ্বিতীয় চালক প্রথম চালককে সাহায্য করবে অথবা নিজে চালনা করবে।

অবশ্য বনহুরের চিন্তাটাই সঠিক। প্রথম চালকের কোনো অসুবিধা হলে দ্বিতীয় চালক তাকে সহায়তা করবে। পৃথিবীর মানুষের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ যেন এরা বৈজ্ঞানিক হিসেবে। দক্ষ কারিগরের চেয়েও বেশি দক্ষ। যেভাবে এই অভিনব যানটি এরা তৈরি করেছে তা বিস্ময়করই শুধু নয়, একেবারে অবাক কান্ড যেন।

বনহুর আসনটির আড়ালে আত্মগোপন করে সবকিছু গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলো। কোন্ যন্ত্রে হাত দিলে কি ভাবে যানটি এগুচ্ছিলো তাই সে ভালভাবে দেখছিলো।

প্রায় পনেরো মিনিট যানটি সৌরজগত ভেদ করে সোজা এগুলো, তারপর নামতে শুরু করলো নিচের দিকে। বনহুর তখনও নিশ্চুপ উবু হয়ে বসেছিলো যানটির পেছন আসনের পেছনে এবং যে কারণেই তাকে কেউ দেখতে পায়নি।

যানটি মিনিট পাঁচের মধ্যে নেমে এলো নিচে।

পাখির হাল্কা ডানার মত আলগোছে নামলো।

চাকতির উপরে চাপ দিতেই আলো নিভে গেলো, যানটি তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বনহুরের দৃষ্টি সব সময় চালকদ্বয়কে লক্ষ্য করছিলো।

এবার চালকদ্বয় নেমে দাঁড়ালো।

তরুণ-তরুণীও হাত ধরে নামলো যান থেকে নিচে।

বনহুর তো সহজে নামতে পারবে না, কাজেই যে নিশ্চুপ রইলো। ওরা যান থেকে নিচে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে যে সোজা হয়ে বসলো আসনটির পাশে।

ভারী সুন্দর লাগছে তার জায়গাটা।

যদিও বনহুর যান থেকে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না তবু সে যা দেখছিলো তাতেই আন্দাজ করে নিলো। বনহুর বুঝতে পারলো এটা সৌরজগতেরই কোনো এক স্থান।

ফিকা বেগুনী রঙের সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ-লতাপাতা ঘেরা জায়গাটা। ফুলে ফলে ভরা বৃক্ষগুলো যেন ঝুঁকে আছে।

একদল তরুণী, অপরূপ তাদের বেশভূষা, বীণা হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো। যানটি থেকে তরুণ-তরুণী অবতরণ করতেই তরুণীদল বীণার ঝংকার তুললো।

অদ্ভুত অপূর্ব সে সুর।

তরুণ-তরুণীর হাত ধরে দু'জন তরুণী নিয়ে চললো। যেন ওরা হাল্কা বাতাসে ভেসে ভেসে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারী মিষ্টি সুরে বীণা বাজাচ্ছে তরুণী দল।

যানটির নিকট থেকে ওরা সরে যেতেই বনহুর চালকের আসনে এসে বসলো। বনহুর প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলো কোন্ যন্ত্রে হাত দিলে যানটির কোন্ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সুদক্ষ চালকের মত বনহুর প্রথম চাক্তি ধরনের যন্ত্রে চাপ দিলো। আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে যানটি হাওয়ায় ভেসে উঠলো। তারপর দ্বিতীয় চাকুতিতে চাপ দিতেই উল্কাবেগে উড়ে চললো, যেন একটি গোলাকার উল্কা তীরবেগে ছুটছে।

নিচে যারা ছিলো তারা তো অবাক, তাদের যানটি আপনা আপনি এভাবে উড়ে গেলো কেন এটা তারা ভেবে পাচ্ছে না, তারা বুঝতেই পারেনি ওটা আপনা আপনি যাচ্ছে না ওর মধ্যে কোনো এক চালক রয়েছে।

যানটি সৌরজগত ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে, কোন্ দিকে যাচ্ছে জানে না বনহুর।

এদের যানে কোনো দিকদর্শন যন্ত্র নেই।

বনহুর পাইলট না হলেও প্লেন চালনা সে জানে, কাজেই আকাশে উড়তে তার কোনো অসুবিধা হয় না। তাই সে কোনো দুর্বলতা বোধ করছিলো না। তবে একটু ভয় যে না হচ্ছিলো তা নয়, কারণ এটা প্লেন বা ঐ ধরনের কোনো যান নয় সম্পূর্ণ আলাদা যান এটা।

যানটি এত দ্রুত চলছিলেদা যে সে কতদূর এসে পড়েছে বুঝতে পারছিলো না। তৃতীয় চাকতি বা যন্ত্রে চাপ দিলো বনহুর।

অমনি যানটি চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করলো।

বনহুর মুহূর্তে যানের আসন থেকে ছিটকে পড়লো পাশের আসনের উপর উবু হয়ে।

ভাগ্যিস আসনগুলো নরম বস্তু দিয়ে তৈরি তাই সে আহত হলো না, নাহলে ভীষণভাবে জখম হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যানটি যখন চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছে তখন বনহুরও ওলট পালট খাচ্ছিলো। সে চেষ্টা করছে কোনো রকমে ঐ তৃতীয় নম্বর চাক্তিটাকে সোজা করে দেবে।

প্লেন হলে হয়তো এতক্ষণে আগুন ধরে যেতো। এটা প্লেন নয় বলেই রক্ষা, যানটি ঘুরপাক খাচ্ছে কিন্তু এগুচ্ছে না মোটেই।

বনহুরের দেহটাও যানটির সঙ্গে ওলট পালট খাচ্ছে। অতিকষ্টে বনহুর ওপাশে চালকের আসন ধরে তৃতীয় নম্বর চাকতি চেপে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে যানটি সোজা হয়ে উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

এবার বনহুর নিচে অবতরণের চাক্‌তিটি চেপে ধরলো। অমনি যানটি নিচে নামতে শুরু করলো। সাঁ সাঁ করে নামছে যানটি।

বনহুর দক্ষ চালকের মত চালকের আসনে বসে মেশিন বা ঐ চাক্‌তি ধরনের যন্ত্রটা চালনা করছিলো।

নামছে যানটি।

হঠাৎ যানটি আছাড় খেয়েও পড়তে পারে তাহলে মৃত্যু তার অনিবার্য। বনহুর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছে, কারণ এই সৌরজগত থেকে ফিরে যাবার আশা তার কম।

যানটি নামছে।

একটা তীব্র নীলাভ আলো যানটির চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

অদ্ভুত সে আলোর ছটা।

যানটি হঠাৎ থেমে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারলো মাটি স্পর্শ করেছে যানটি।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চাকতিতে চাপ দিলো বনহুর, অমনি যানটি একেবারে থেমে গেলো।

বনহুর যানটির বাইরে তাকালো।

দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়লো তার, আশেপাশে কোনো বৃক্ষলতা নেই, শুধু জমকালো পাথর এবং চাপ-চাপ ধূসর মাটি—ঠিক পৃথিবীর পাহাড়ের মত দেখতে।

বনহুর যান থেকে নেমে দাঁড়ালো।

পরক্ষণেই মনে পড়লো যানটিই তার সম্বল, কারণ এটা কোন্ জায়গা কে জানে, জানে না এখানে কোনো বিপদ লুকিয়ে আছে কিনা তার জন্য। বনহুর যানটিতে পুনঃ প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো, কারণ তার অজ্ঞাতে কেউ যেন যানটির মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে।

আবার নেমে এলো বনহুর যান থেকে।

সম্মুখে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো পৃথিবীর পর্বতমালা অথবা পাহাড় শ্রেণীর মত পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ফিকা বেগুনী রঙের গাছপালা।

বনহুর আরও দেখতে পেলো পাহাড়গুলোর গায়ে তারার মালার মত অসংখ্য মূল্যবান পাথর জ্বলজ্বল করছে।

এগুতে লাগলো বনহুর।

জনপ্রাণীহীন জায়গা।

এদিকে কোনো পথ বা রাস্তার চিহ্ন নেই। শুধু উচুনিচু পর্বতমালার অথবা পাহাড়ের সারি।

বনহুর অবাক হয়ে এগুচ্ছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে বনহুর, একি আশ্চর্য, পৃথিবী ছাড়াও তাহলে অন্য গ্রহে মানুষ এবং জীবজন্তু আছে। গাছপালা বৃক্ষলতা আছে। শুধু চাঁদের দেশে কোনো জনপ্রাণী নেই......

বনহুর জানে না চাঁদের দেশে এক ধরনের জীব আছে যে জীব অক্সিজেন ছাড়াও বাঁচতে পারে। যে জীবটা রহমানের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো ক্যারিলং-এর সেই অদ্ভুত ক্যামেরার পর্দায়। জীবটা চক্ষু, কান এবং নাকহীন। দেহটা তার পর্বত সমতুল্য। বয়স তার কত কেউ নির্ণয় করতে পারবে না, কারণ চন্দ্রপৃষ্ঠে পৃথিবীর মানুষ অবতরণ করতে সক্ষম হলেও চন্দ্রপৃষ্ঠের সব জায়গা তারা দর্শন করতে পারেননি, কারণ চন্দ্রপৃষ্ঠে কোনো অক্সিজেন নেই, তাই পৃথিবীর মানুষ বেশিক্ষণ সেখানে স্থায়ী হতে পারেনি, কাজেই অনেক কিছু অজ্ঞাত রয়ে গেছে তাঁদের কাছে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে এক ধরণের জীব রয়েছে যার তুলনা করা যায় রক্তখাদক পাথরের সঙ্গে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে কোনো কোনো সমুদ্রে এক ধরনের পাথর আছে যে পাথর কোনো জীবন্ত জীবকে নাগালের মধ্যে পেলে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে রক্ত চুষে নেয়। এ পাথর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পাথর। লোকে বলে জীবন্ত পাথর।

চন্দ্রপৃষ্ঠে ঐ ধরনের জীব আছে যার কোনো অক্সিজেন প্রয়োজন হয় না।

চন্দ্রপৃষ্ঠের কথা বনহুর জানে না, কারণ সে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করার সুযোগ পায়নি। যদি কোনোদিন সুযোগ আসে তখন বনহুর চন্দ্রপৃষ্ঠেও অবতরণ করে চন্দ্রপৃষ্ঠের রহস্য উদ্ঘাটন করতে হয়তো সক্ষম হবে।

বনহুর না জানলেও বৈজ্ঞানিক মহল জানেন পৃথিবী ছাড়াও বিভিন্ন গ্রহে জীবজন্তু এমন কি মানুষও বসবাস করছে এবং তারা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

আজ বনহুর নিজেও ঘটনাক্রমে মঙ্গল গ্রহে এসে পড়েছে এবং সে অনেক কিছু জানতেও পারলো। যানটি থেকে নেমে বনহুর এগুতে লাগলো, সম্মুখে সারি সারি পর্বতমালা। ভারী সুন্দর জ্বলজ্বলে পাথর পর্বতমালার গায়ে দানার মালার মত জ্বলছে।

বনহুর এগিয়ে চলেছে।

মঙ্গল গ্রহে আসার পর বনহুর কোনো জলপ্রপাত দেখতে পায়নি। কিছুদূর এগুতেই এবার বনহুর জলপ্রপাত দেখতে পেলো। আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো সে। দ্রুত এগিয়ে চললো জলপ্রপাতের দিকে।

পর্বতমালার সারি, মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে ঝরণা বা জলপ্রপাতটি। সচ্ছ নির্মল পানি, বনহুরের চোখ ঝলসে যাচ্ছে যেন। এত সুন্দর পানি অনেকদিন তার নজরে পড়েনি। বনহুর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ঝরণার পাশে দাঁড়ালো।

জায়গাটা বেশ উঁচু।

জলপ্রপাত পর্বতমালার গা বেয়ে নিচে নেমে গেছে। অসংখ্য জ্বলেজ্বলে মূল্যবান পাথর ঝলমল করছে জলপ্রপাতের মধ্যে।

ঝাপসা আলো-আঁধারের লুকোচুরি।

পাথরের নূড়িগুলো জলপ্রপাতের মধ্যে জ্বলছে যেন।

বনহুর অবাক চোখে দেখছে।

ইচ্ছে হচ্ছে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে। এমন সময় হঠাৎ কানে ভেসে এলো অদ্ভুত সুমিষ্ট হাসির ঝংকার।

বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো নিচে।

জলপ্রপাতের গড়িয়ে পড়া স্থানে, যেখানে ঝরণাধারা কুলকুল করে বয়ে চলেছে।

সহসা বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছে না। সে দেখতে পেলো কতকগুলো তরুণী একটি তরুণীকে ঘিরে পানি ছড়িয়ে দিচ্ছে তার চোখেমুখে।

তরুণী দু'হাতে চোখ ঢেকে রেখে পানি থেকে নিজের মুখকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

অপরূপ সে দৃশ্য।

মুগ্ধ বনহুর।

সম্বিৎ হারিয়ে ফেললো বনহুর, তরুণীটির সৌন্দর্য তাকে অভিভূত করে ফেললো।

হাসছে ওরা খিল খিল করে।

পৃথিবীর মেয়েরা যেমন হাসে ঠিক তেমনি হাসছে ওরা।

সচ্ছ সাবলীল জলধারার বুকে দাঁড়িয়ে যেন দেবকন্যা। বনহুরের সম্বিৎ ফিরে আসে, সে ফিরে তাকায় বহুদূরে যেখানে সে যানটি রেখে এসেছে।

বনহুর দেখতে পায় যানটি ঠিক জায়গায় রয়েছে।

অদ্ভুত যান।

যেখানে খুশি নামানো-উঠানো যায়।

কোনো প্রশস্ত জায়গার প্রয়োজন হয় না। এত সুন্দর সহজ যান ইতিপূর্বে সে কোনোদিন দেখেনি। শুধু সুন্দরই নয়, এত দ্রুত কোনো যান চলতে পারে তাও সে জানতো না এর পূর্বে। ঐ যানটি যেন বনহুরের সাথী।

বনহুর যানটির দিকে একনজর তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর পুনরায় ফিরে তাকালো জলপ্রপাতের সেই সমতল অংশে, যেখানে তরুণীদল উচ্ছল হয়ে স্নান করছে।

এবার তরুণীদল সাঁতার কাটছে।

মাঝের সেই রূপসী তরুণী সর্বাগ্রে রয়েছে।

একরাশ রেশমী চুল ছড়িয়ে আছে তার কাঁধে-পিঠে কপালে। কাজলটানা তার দুটি চোখ, অপরূপ তার চাউনি।

বনহুর মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে।

তরুণীদল সাঁতার কাটছে, যেন এরা পৃথিবীর মানুষ। তেমনি হাসছে ওরা খিল খিল করে। এ ওর দেহে পানি ছড়াচ্ছে।

হঠাৎ বনহুরের পা একটা ছোট পাথরে লেগে পাথরটা গড়িয়ে পড়ে নিচে, একেবারে ঝরণার পানিতে।

ঝুপ করে শব্দ হয়।

সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হরিণের মত চমকে উঠে তরুণীদল। তারা তাকাতেই বনহুরকে দেখে ফেলে।

অমনি সবাই ভয়বিহ্বল স্বরে কিছু উচ্চারণ করলো। সাঁতার কাটা বন্ধ করে ওরা উঠে এলো তীরে।

বনহুর আত্মগোপন না করে সেও এগুতে লাগলো তরুণীদের দিকে।

এটা এমন দেশ হাঁটতে তেমন কোনো কষ্ট হয় না, মনে হয় যেন বাতাসে ভেসে ভেসে এগুচ্ছে।

বনহুর অল্পক্ষণে তরুণীদের কাছে এসে গেলো।

তরুণীরা সবাই দলবদ্ধভাবে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলো, বনহুর এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে।

তরুণীরা হঠাৎ একটা নতুন ধরনের মানুষ দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। তারা পালাতে গিয়ে পারলো না, এ ওর হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর জানে, সে কিছু বললে ওরা বুঝবে না, তবু হেসে বললো— ভয় নেই, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করবো না। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে কথাটা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলো বনহুর।

আজ সৌরজগতে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত তরুণীদের সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ একটা মুখ ভেসে উঠলো বনহুরের চোখের সম্মুখে। এমনি একজন ছিলো যে তার কথা বুঝতো না। শুধু, হাসতো, কাঁদতো, রাগ, অভিমান করতো। বনহুর তাকে কথা বলতে শিখিয়েছিলো, পরে সে তার নাম ধরে ডাকতো। সেই জংলীরাণী...বনহুরের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

বনহুরকে দেখে ওরা ভীষণ চমকে গেলেও আশ্চর্যও কম হয়নি। এ আবার কেমন মানুষ ভাবছে ওরা মনে মনে। বনহুরের চোখ ছলছল হতে দেখে তরুণীদের হয়তো মায়া হলো। তারা হয়তো বনহুরকে কোনো অসহায় লোক মনে করেছে, তাই তারা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো।

তরুণীগণ বনহুরকে কিছু জিজ্ঞাসা করলো।

বনহুর বুঝতে না পারলেও ইংগিতে নিজের যানটিকে দেখিয়ে বললো— আমি বিদেশী মানুষ। তোমাদের কাছে জানতে চাই এটা কোন্ দেশ?

ওরা বনহুরের কথা কিছু বুঝতে পারলো না।

একজন তরুণী বনহুরকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে সেই তরুণীকে কিছু বললো যে তরুণী সবার চেয়ে আলাদা।

তরুণী বনহুরের দিকে তাকাতেই বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

তরুণী লজ্জায় দৃষ্টি নত করে নিলো।

মৃদু হাসলো বনহুর, অস্ফুট কণ্ঠে বললো— লজ্জা নারীর ভূষণ...লজ্জাবতী নারী অপরূপ...

ওরা বনহুরের উক্তির একটি বর্ণও বুঝলো না, এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো।

অপরূপ তরুণী পুনরায় তাকালো বনহুরের দিকে। ওর মুখোভাব লক্ষ্য করে বেশ বোঝা গেলো বনহুরকে তরুণীর খুব ভাল লেগেছে।

সে পাশের সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করে কিছু বললো।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনী সবার কানেকানে কিছু বললো।

এবার দলের মধ্যে বেশ একটা গুঞ্জন শোনা গেলো। তাদের নিজ ভাষায় কিছু বলাবলি করছে ওরা।

বনহুর বুঝতে পারলো তাকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছে ওদের মধ্যে। বেশ কিছু কথাবার্তা চলছে, মাঝখানে তরুণীই এদের দলনেত্রী তাতে কোনো ভুল নেই। দলনেত্রী তাকে নিয়ে কিছু বলেছে, যা নিয়ে সবার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতীক্ষা করছে বনহুর।

শেষ পরিণতি কি দাঁড়ায়।

মাঝে মাঝে নিজ যানটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে সে। যানটা ঠিক জায়গায় আছে তো? ওটাই যে তার সম্বল বলা যায়।

হঠাৎ মনে পড়লো দিপালীর কথা।

তখন ঘুমাচ্ছিলো সে।

নিশ্চয় জেগে উঠে তাকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ ঘাবড়ে যাবে। যাবার কথাই বটে, হয়তো কত খুঁজছে, তাকে দেখতে না পেয়ে হয়তো বা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। সম্পূর্ণ অজানা এক দেশ....

বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, একটি তরুণী এগিয়ে এসে তার হাত স্পর্শ করলো।

তরুণী বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা চেপে ধরতেই বনহুর বিস্ময়ে থ' হয়ে গেলো। এত নরম স্পর্শ সে কোনোদিন অনুভব করেনি। বনহুর শুনেছিলো কতকগুলো নারীদেহ নাকি ননীর পুতুলের মত নরম, এ যে সেই নারী— তার গল্পে শোনা ননীর পুতুল।

পৃথিবীর মানুষ বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে, পৃথিবী ছাড়াও আর কোনো গ্রহে মানুষ বাস করছে এবং তারা ঠিক মানুষেরই মত। তাদের হাসি-কান্না ব্যথা-বেদনা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এ ছাড়াও পৃথিবীর মতই পাহাড়-পর্বত গাছ-পালা সব আছে। যদিও কিছু আলাদা যেমন বৃক্ষলতাগুলোর রং পৃথিবীর বৃক্ষ-লতাপাতার মত গাঢ় সবুজ না, ফিকে বেগুনী। এমন কি দুর্বাঘাসগুলোও ফিকে বেগুনী রঙের। তবে পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক বেশি অমূল্য সম্পদ রয়েছে এসব গ্রহে।

বনহুর যে গ্রহে অবস্থান করছে সেটা মঙ্গল গ্রহ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করতে সক্ষম হলেও এখনও অন্য কোনো গ্রহে তারা পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। বনহুর ভাগ্যক্রমে হঠাৎ মঙ্গল গ্রহে

পৌঁছার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, এ জন্য সে নিজকে ধন্য মনে করছে। তরুণী তার হাতে হাত রাখতেই বনহুরের মনে একরাশ প্রশ্ন ঝুরির মত ঝরে পড়লো।

মাঝে মাঝে বনহুরের মনে হয় সে স্বপ্ন দেখছে, যা সে দেখছে, অনুভব করছে, তা যেন বাস্তব নয় কিন্তু সে জানে সবকিছুই বাস্তব সত্য।

যে তরুণী-এ মুহূর্তে তার হাতে হাত রেখেছে তাকে স্বপ্নের রাণী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না, কিন্তু আসলেই স্বপ্নের রাণী নয় সে বাস্তব এবং সত্য একটি তরুণী।

বনহুরের হাত ধরে অদ্ভুত এক শব্দ উচ্চারণ করলো তরুণী।

বনহুর বুঝতে পারলো তাকে ওদের সঙ্গে যাবার জন্য বলছে। কাজেই বনহুর তরুণীর হাতে হাত রেখে অগ্রসর হলো।

অন্যান্য তরুণী তাদেরকে অনুসরণ করলো।

বনহুরের কঠিন বলিষ্ঠ হাতখানা তরুণীর কোমল নরম হাতের মুঠায় ঘেমে উঠছিলো। বনহুরকে ওরা কোথায় নিয়ে চলেছে জানে না বনহুর।

সে যন্ত্রচালিত পুতুলের মত তরুণীর সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে।

তাকে ঘিরে নিয়ে চলেছে তরুণীদল।

সর্বাগ্রে এগুচ্ছে সেই দলনেত্রী তরুণীটি।

তার বেশ ভূষা অন্যান্য তরুণীর চেয়ে আলাদা, চেহারার মধ্যেও একটু আলাদা ভাব পরিলক্ষিত হয়।

বনহুর মন্ত্রমুগ্ধ।

একবার সে পেছন ফিরে যানটিকে দেখে নিলো, ওটাই যে তার সম্বল।

তরুণীদল হয়তো বা বনহুরের মনের কথা বুঝলো, তাই তারাও যানটিকে লক্ষ্য করে কিছু বললো বনহুরের উদ্দেশ্যে, হয়তো বা বললো ওটা ওখানেই থাকবে, কেউ ওটা স্পর্শ করবে না।

অবশ্য বনহুর অনুমান করলো তারা এই ধরনের কিছু বললো। বনহুর এবার কতকটা নিশ্চিন্ত মনে এগুলো ওদের সঙ্গে।

হাওয়ায় ভর করে যেন তারা হাঁটছে।

হাঁটতে মোটেই তাদের কষ্ট হচ্ছে না, আর এগুচ্ছে খুব দ্রুত গতিতে। অল্পক্ষণেই অনেকটা পথ তারা এসে গেলো।

পর্বতমালার মাঝামাঝি একটি সুন্দর পথ।

সেই পথে অগ্রসর হলো তরুণীদল।

বনহুরের হাতখানা এখনও তরুণীর হাতের মুঠায়। হাসছে বনহুর মৃদু মৃদু, তাকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। তাকে নিয়ে ওরা কি করতে চায়? কি ওদের উদ্দেশ্য তাই বা কে জানে......

বনহুরের ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটলো।

একটি সুন্দর উদ্যান রয়েছে পর্বতমালার মাঝামাঝি। উদ্যানে নানা ধরনের বৃক্ষলতা নানা বৃক্ষে নানা ধরনের ফলফুল। সবকিছুর রঙই ফিকা বেগুনী, কোন কোন বৃক্ষের ফুল কিছু গোলাপী মনে হচ্ছে।

বনহুরকে সঙ্গে করে ওরা সেই মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করলো।

অবাক চোখে দেখছে বনহুর।

বনহুরকে দেখে ওরাও কিন্তু কম অবাক হয়নি। মনে ওদের নানা প্রশ্ন— কে এই ব্যক্তি যাকে তারা নতুন দেখছে।

সুন্দর উদ্যানের মাঝামাঝি একটি আসন।

বনহুর চমকে উঠলো সেই সুউচ্চ আসনে একটি বৃদ্ধ দু'চোখ মুদিত অবস্থায় বসে আছে।

তরুণীগণ সেই বৃদ্ধের সম্মুখে এসে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানালো।

বনহুর মাঝামাঝি রয়েছে, সেও তরুণীদের দেখে সেইভাবে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানলো।

বৃদ্ধ চোখ মেলে তাকালো।

চোখ মেলতেই বৃদ্ধের দৃষ্টি পড়লো বনহুরের উপর। বিস্ময় নিয়ে তাকালো এবং বনহুরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে বললো কিছু।

একজন তরুণী জবাব দিলো।

বৃদ্ধ তখন অপরূপ রূপসী তরুণীটিকে নিজের পাশে ডাকলো।

তরুণী বৃদ্ধের আদেশ পালন করলো।

বৃদ্ধ এবার তরুণীটিকে বসার জন্য ইংগিত করলো।

তরুণী বসলো বৃদ্ধের পাশে।

বৃদ্ধ করতালি দিয়ে একবার দু'বার তিনবার।

অমনি একজন তরুণী একটি মণিমুক্তাখচিত রেকাবিতে করে একটি বীণা নিয়ে হাজির হলো।

বনহুর অবাক হয়ে গেছে, তরুণীগণ ঝরণার পানিতে স্নান করে সিক্ত বসনে উঠে এসেছিলো তীরে অথচ অল্পক্ষণ পর তাদের শরীরের আবরণ শুস্ক বলে মনে হচ্ছিলো।

বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো বনহুর কিন্তু নীরব থাকা ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না, তার কারণ সে কিছু জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয়ই তারা তার প্রশ্নের জবাব দেবে না বা দিতে পারে না, কারণ তার কথার একটি অর্থও বুঝতে পারবে না ওরা, তাই মনে নানা প্রশ্ন আলোড়ন সৃষ্টি করলেও চুপচাপ রইলো এবং ওদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলো।

তরুণীর হাতে বৃদ্ধ বীণা তুলে দিলো।

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই সুন্দরী তরুণীর মুখ, যাকে সে রাজপ্রাসাদ সমতুল্য বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে অনেকগুলো বৃদ্ধ আর বৃদ্ধার সম্মুখে বসে বীণায় ঝংকার তুলতে দেখেছিলো। এ যে সেই তরুণীর অনুকরণে বীণা বাজাতে শুরু করলো।

অন্যান্য তরুণী বনহুরকে ঘিরে ধরে অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করে কি বলছে।

বনহুর তাদের উক্তি বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারলো এরা তার সঙ্গে ঐ অপরূপ তরুণীর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে তবে কি তাকে ঐ তরুণী পছন্দ করে বসেছে? হয়তো বা তাই হবে নইলে..........না না, তা কি করে সম্ভব! বনহুর চারপাশে তাকায় কি করে এখান থেকে পালানো যায়। যানটির কাছে কোনো রকমে পৌঁছতে পারলেই সে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে পারে কিন্তু কি করে তা সম্ভব, এরা তাকে যে ভাবে ঘেরাও করে ফেলেছে...বনহুর তাকালো বৃদ্ধের মুখের দিকে। বৃদ্ধ স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কোনো উপায় নেই এই বেষ্টনী ভেদ করে সে সরে পড়ে। ভেবে পায় না বনহুর এত শীঘ্র এরা একটা কঠিন ব্যাপারের সমাধান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এদের এই বিস্ময়কর আচরণে বনহুর ঘাবড়ে না গেলেও ভীষণ ভড়কে গেলো।

তবে কি তাকে বিয়ে করতে হবে?

বনহুর আপন মনে হাসলো একটু।

সম্মুখস্থ তরুণী বীণা বাজিয়ে চলেছে।

অন্যান্য তরুণী কঠিনভাবে হাত ধরে রেখেছে বনহুরের যেন সে পালাতে না পারে। ওদের নরম তুলতুলে হাতের স্পর্শ ভারী আরামদায়ক বটে, তাই বলে সে ওদের কাজে বা মতে সায় দিতে পারে না......

ভাবনা ওর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, একজন তরুণী ওকে নিয়ে চলে সামনের দিকে যেখানে বসে সেই অপরূপ সুন্দরী তরুণী বীণা বাজিয়ে চলেছে।

বৃদ্ধ কিছু উচ্চারণ করলো।

তরুণী বীণা রেখে উঠে দাঁড়ালো।

বনহুর যেন এ মুহূর্তে নিরুপায়, তরুণীর দৃষ্টির কাছে তার যেন পরাজয় হয়েছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত হতভম্ব হয়ে পড়ে বনহুর ক্ষণিকের জন্য।

তরুণী এগিয়ে আসতেই বৃদ্ধ বনহুরের হাতখানা তুলে নিলো হাতে, তারপর তরুণীর হাতখানা তুলে নিয়ে বনহুরের হাতের উপর রাখলো। কিছুই যেন অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছে না বনহুর, একি সে স্বপ্ন দেখছে। একটি কথাও ওদের সে বুঝতে পারছে না এবং সে নিজেও কিছু বুঝিয়ে বলতে পারছে না।

সব যেন কেমন গোলক ধাঁধা মনে হচ্ছে তার কাছে।

বনহুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাবে, ছুটে পালিয়ে যাবে সে কিন্তু পারছে না। পা দু'খানা যেন তার নড়তে চাইছে না আর।

এবার বৃদ্ধ হাস্যোজ্জল মুখে অদ্ভুত কিছু উক্তি উচ্চারণ করলো, সঙ্গে সঙ্গে একদল তরুণী তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে বীণা নিয়ে হাজির হলো।

বৃদ্ধ বীণাগুলো তুলে নিয়ে দন্ডায়মান তরুণীদের হাতে দিতে লাগলো।

দেওয়া শেষ হলে তরুণীদল যারা বীণা হাতে নিয়ে প্রবেশ করেছিলো তারা কোথায় চলে গেলো। যে তরুণীদল অপরূপ তরুণীর সঙ্গে ঝরণার পানিতে সাঁতার কাটছিলো এবং তার সঙ্গে এসেছে তারা নিজ নিজ বীণাতে ঝংকার তুললো।

বনহুর মোহগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতের মুঠায় অপরূপার হাতখানা তখনও রয়েছে।

নির্বাক দৃষ্টি মেলে অপরূপাকে দেখছে বনহুর।

অপরূপও তাকিয়ে আছে বনহুরের চোখের দিকে। কোনোদিন সে যেন এমন পুরুষ দেখেনি তাই সে নির্বিক চোখে দেখছে।

বীণার ঝংকারে উদ্যানটি মোহময় হয়ে উঠেছে।

এমন সুর কোনোদিন বনহুর শোনেনি। তার মনে এ সুর ঐ রাজপ্রাসাদের সুরের প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছে।

বনহুর বাস্তব জগতের বলিষ্ঠ পুরুষ, সৌরজগতের এসব তার কাছে রূপকথার কাহিনীর মতই লাগছে। কিন্তু আসলে এটা রূপকথার কাহিনী নয়। বনহুর ভাবছে পৃথিবীতে যদি সে ফিরে যেতে পারে, তাহলে এসব কথা

বললে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। তারা বলবে এ হয়তো রূপকথার গল্প। আসলে তা নয়, সব সত্য এবং বাস্তব স্রষ্টার সীমাহীন সৃষ্টির যৎসামান্য একটা দিক হলো পৃথিবী। এই পৃথিবী ছাড়াও সৃষ্টিকর্তার সীমাহীন সৃষ্টির অনেক কিছু রয়ে গেছে মানুষের জ্ঞানচক্ষুর অন্তরালে। বড় বড় দক্ষ বৈজ্ঞানিকগণ এ নিয়ে নানাভাবে গবেষণা করে চলেছেন। ভূগর্ভ, সাগরের তলদেশ, পর্বতশৃঙ্গ এমন কি পর্বতের অভ্যন্তরে কি আছে, কোন্ গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে তাও তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছেন বা হয়েছেন। এমন কি সৌরজগতেও তাঁরা গবেষণা চালিয়েছেন। যে চাঁদ মানুষের কল্পনার বস্তু ছিলো, কবি-সাহিত্যিকগণ যে চাঁদকে নিয়ে তাঁদের সাহিত্যভান্ডার পরিপূর্ণ করে চলেন সেই চাঁদেও পৃথিবীর মানুষ পা রাখতে সক্ষম হয়েছে। কেউ কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছে চন্দ্রপৃষ্ঠে পৃথিবীর মানুষ অবতরণ করে নতুন আবিষ্কারে জয়যুক্ত হবেন? তাও সম্ভব হয়েছে।

সৌরজগত নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ নানাভাবে গবেষণা চালিয়েছেন এবং তাঁরা জানতে পেরেছেন পৃথিবী ছাড়া কোনো কোনো গ্রহে প্রাণী আছে তা কেমন ধরনের প্রাণী তা হয়তো এখনও ভালভাবে জানা যায়নি।

তবে হঠাৎ কোনো সময় এক অদ্ভুত ধরনের যান সৌরজগত থেকে পৃথিবীর আকাশে নেমে আসে। যে যানটির নাম দেওয়া হয়েছে উড়ন্ত শশা। উড়ন্ত শশা বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন পৃথিবী ছাড়াও সৌরজগতের গ্রহগুলোতেও মানুষ বসবাস করছে এবং তাঁরা জ্ঞান গরিমায় পৃথিবীর মানুষের চেয়ে কম নয়। এমন কি বিজ্ঞানের দিক দিয়ে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণের চেয়েও বেশি অভিজ্ঞ যেন তারা, কারণ শশার গতিবেগ রকেটের চেয়েও দ্রুত বলে মনে হয়।

উড়ন্ত শশা পৃথিবীর আকাশে হঠাৎ দেখা যায় এবং তা ক্ষণিকের জন্য। একটা নীল উজ্জল আলোর ছটা বেরিয়ে আসে সেই উড়ন্ত শশা থেকে।

পৃথিবীর মানুষ এই যানটিকে স্বচক্ষে দর্শন করেছেন। এমন কি ক্যামেরাম্যানগণ এই বিস্ময়কর যানটির ছবিও গ্রহণ করেছেন এবং সেই ছবি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশও পেয়েছিলো।

যানটি কোন্ গ্রহ থেকে পৃথিবীর আকাশে বিচরণ করতে গিয়েছিলো তা জানে না বনহুর তবে সে অনুমান করে নিয়েছিলো যানটি ছিলো সৌরজগতের কোনো গ্রহের আবিষ্কার এবং সেখানেও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি

আছেন, যাঁরা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে কোনো অংশে কম নন। এখন বনহুর তা মনে প্রাণে অনুধাবন করতে পারছে। মঙ্গল গ্রহে এসে পৃথিবীর মানুষের মত সজ্ঞান সুন্দর মানুষ দেখবে ভাবতে পারেনি সে কোনোদিন.....

বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠে কিছু উচ্চারণ করলো।

তরুণীরা তাদের বীণা বাজনা থামিয়ে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে।

তরুণীর হাতখানা বনহুরের হাতের মুঠায় রয়েছে। বনহুর ইচ্ছা করেও তরুণীর হাতখানা নিজ হাতের মুঠা থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না।

তরুণীদল এবার সেই অপরূপ তরুণীটিকে সঙ্গে করে বৃদ্ধকে নত মস্তকে অভিবাদন করলো। অগত্যা বনহুরও বাধ্য হলো তরুণীদের মত অনুকরণে অভিবাদন জানাতে।

বৃদ্ধ হাত তুলে আশীর্বাদ করলো। যেমন করে পৃথিবীর মানুষ আশীর্বাদ জানায় ঠিক তেমনি করে।

তারপর তরুণীদল বনহুর আর সেই অপরূপ তরুণীটিকে নিয়ে চললো উদ্যানের বাইরে।

বনহুর এর শেষ কি দেখতে চায় তাই ওদের কাজে কোনো বাধা দিলো না। ওরা যেভাবে তাকে নিয়ে চলেছে ঐভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে সে। এরা তাকে কোথায় নিয়ে যায় দেখতে চায় সে।

উদ্যানটি অতি মনোরম।

গাছে গাছে বেগুনী রঙের ফুল এবং পাতা। কোনো কোনো গাছে রসালো ফল ঝুলছে। অসংখ্য ফল। বনহুরের ভারী লোভ হচ্ছিলো ফল দেখে, কারণ সে কিছুটা ক্ষুধা অনুভব করছিলো।

তরুণীদল বনহুরকে নিয়ে পর্বতের মাঝামাঝি একটি সুন্দর গুহামুখে এসে দাঁড়ালো।

বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো বনহুর গুহামুখে অগণিত মূল্যবান পাথর ঝল মল করছে। যেন কোনো রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার।

বনহুর যখন তরুণীদের সঙ্গে গুহায় প্রবেশ করলো তখন সন্দেহ তার সঠিক হলো, কারণ গুহায় প্রবেশ করে সে দেখলো সেটা একটা গুপ্তদ্বার বা গোপন পথ। ভিতরে প্রকান্ড রাজপ্রাসাদ, বাইরে পর্বতমালা। মূল্যবান পাথর দিয়ে সিংহাসনের মত আসন তৈরি করা হয়েছে। খাট-পালঙ্ক, এমন কি ড্রেসিং আয়নার মত আয়নাও তৈরি করা হয়েছে পাথর দিয়ে।

একটির পর একটি কক্ষ।

বনহুর যত দেখছে তত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল পাথর দিয়ে দীপ্ত আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে। মনি মুক্তা হীরা জহরতের মত সুন্দর সুন্দর পাথর দিয়ে তৈরি দেয়াল। আলোর ফুলঝুরি যেন ঝরে পড়ছে দেয়াল থেকে।

একটি কক্ষের সম্মুখে এসে তরুণীদল থমকে দাঁড়ালো। তারা সুন্দর কণ্ঠে সঙ্গীত ধ্বনির মত গান গাইতে শুরু করলো। গানের একটি বর্ণও বুঝতে পারলো না বনহুর।

অপরূপা এবার বনহুরের হাত ধরে প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

মনিমুক্তা খঁচিত দেয়াল।

চারিদিকে আলোর ফুলঝুরি।

অসংখ্য তারার মালা যেন জ্বলছে।

সুন্দর শয্যা একপাশে।

একপাশে ড্রেসিংটেবিলের মত করে পাথর বসানো টেবিল জাতীয় বস্তু।

বনহুর অপরূপার হাত ধরে কক্ষে প্রবেশ করতেই নিজের প্রতিচ্ছবি সেই ড্রেসিং টেবিলের পাথরফলকে এসে পড়লো।

নিজের চেহারা সে এমনভাবে দেখবার সুযোগ সৌরজগতে আসার পর এই প্রথম পেলো। নিজকে বনহুর নিজেই চিনতে পারছে না যেন। বনহুর নিজে জানতো সে একজন সুপুরুষ সবদিক দিয়ে, তবে আজ সে নিজের চেহারার দিক থেকে নিজেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না। আজ সে যেন নিজকে নতুন রূপে দেখতে পেলো।

নিজের চেহারা আয়নার মত পাথরে দেখে সে আপন মনে হাসলো।

তরুণী কিছু বললো বনহুরকে লক্ষ্য করে।

বনহুর বুঝতে না পারলেও এটুকু সে বুঝতে পারলো তাকে শয্যার দিকে ডাকছে। এগুলো বনহুর তরুণীর হাতে হাত রেখে, কেমন এক মধুর আবেশ অনুভব করছে সে।

এ মুহূর্তে এমন অবস্থায় তাকে যদি দিপালী অথবা তার পরিচিত কেউ দেখতো তাহলে তাকে কি মনে করতো কে জানে।

তরুণীর চোখে বনহুরের চোখ।

নিষ্পলক নয়নে দেখছে বনহুরকে। দৃষ্টি গিয়ে পড়লো বনহুরের শয্যার উপর। চাপ-চাপ শুভ্র তুলো দিয়ে শয্যা রচনা করা হয়েছে। এত সুন্দর নরম শয্যা এর পূর্বে বনহুর দেখেনি কোনোদিন।

বনহুরের হাতখানা মুক্ত করে দিয়ে তাকে শয্যায় বসিয়ে দিলো অপরূপা।

অত্যন্ত আরামদায়ক শয্যা। এই প্রথম অনুভব করলো বনহুর। সেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে তাকে এবং দিপালীকে শয়নের জন্য এই ধরনের শয্যা দিয়েছিলো প্রথম বৃদ্ধ লোকটি।

কিন্তু বনহুর সে বিছানায় শোয়নি। দিপালীর জন্য শয্যা সে ত্যাগ করে মেঝের উপর ঘুমিয়ে ছিলো। এখন বনহুর শয্যায় বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে একজন তরুণী একটা মূল্যবান রেকাবিতে করে কিছু ফলমূল এবং পানীয় নিয়ে হাজির হলো।

তরুণীটিকে অপরূপা, ইংগিত করলো সম্মুখে টেবিলকার বস্তুটার উপরে ফলমূলের রেকাবিটা রাখার জন্য। আগন্তুক তরুণীটি অপরূপার নির্দেশে রেকাবি রেখে চলে গেলো।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে দেখছে এবং অনুভব করছে সবকিছু। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ছাড়া একটি পুরুষও নজরে পড়েনি এ পর্যন্ত। শুধু নারীই যেন এ রাজ্যের সবকিছু। বনহুর আরও অনুমান করলো, যে দু' চার জনকে দেখেছে তারা অনেকে বৃদ্ধ, কিছু তরুণও নজরে পড়েছে কিন্তু সংখ্যায় নিতান্ত কম।

এখানে সে এসেছে অলৌকিকভাবে। কোথায় এলো তাও জানে না বনহুর। সব যেন স্বপ্ন অথবা কল্পনা বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। কিন্তু সে জানে এসব স্বপ্ন বা কল্পনা নয়, সব বাস্তব।

মঙ্গল গ্রহে এসে তার জীবনে এমন একটি অধ্যায় রচনা হবে তা কোনোদিন কি ভেবেছিলো বনহুর। ভাবেনি কোনোদিন, কল্পনাও করেনি হঠাৎ সে পৃথিবী ছেড়ে একেবারে সৌরজগতে এসে পৌছবে। বনহুর যা আশা করেনি তাই যেন তার ভাগ্যে ঘটে গেলো। ক্যারিলংএর আড্ডাখানায় সে যদি না যেতে পারতো তাহলে এ সুযোগ কোনোদিন আসতো না তার জীবনে। বনহুরের স্মরণ হয় মিস লুনার কথা, হতভাগিনী মিস লুনা নিজের জীবন দিয়ে ক্যারিলংকোর আস্তানার সন্ধান তাকে দিয়েছিলো......

বনহুরকে আনমনা দেখে অপরূপা কিছু বললো।

বনহুর নীরব।

অপরূপা একটি পাত্রে তরল পদার্থ ঢেলে পাত্রটা এগিয়ে ধরলো বনহুরের দিকে।

বনহুর গ্রহণ না করে পারলো না, কিন্তু সে পান না করে সম্মুখ টেবিলে রাখলো পাত্রটা। সে একটি ফল তুলে নিলো হাতে।

বেশ ক্ষুধা অনুভব করছিলো বনহুর।

ফলটার রং এবং গন্ধ তাকে আকৃষ্ট করে তুললো। সে একের পর এক ফল খেয়ে চললো। একটি, দুটি, তিনটি ফল খাবার পর বনহুর বড় তৃপ্তি অনুভব করলো।

তরুণী তাকে অপর একটি ফল হাতে তুলে দিতে গেলো।

বনহুর হেসে বললো—না, আর খাবো না।

তরুণী পানীয় তুলে ধরলো এবার।

বনহুর বললো—হুঁ হুঁ লাগবে না।

তবু তরুণী পাত্রটা বনহুরের মুখে তুলে ধরলো, বনহুর হাত বাড়িয়ে পাত্র হাতে নিলো কিন্তু পান না করে তরুণীর মুখের কাছে ধরলো।

তরুণী সেই তরল পদার্থ সুধা পান করলো।

দু'চোখে তরুণীর খুশির বন্যা ঝরে পড়ছে।

অপরূপা মধুর কণ্ঠে কিছু বললো বনহুরকে, বনহুর তার একবর্ণও বুঝতে পারলো না। খিলখিল করে হাসছে সে। বড় মধুর বড় মিষ্টি সে হাসি, বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরলো অপরূপা।

বনহুর যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছে ধীরে ধীরে। তার হাত দু'খানা অপরূপার দেহটা বেষ্টন করে ধরলো। এত নরম অপরূপার দেহ। বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে যেন একটি মোমের পুতুল।

বনহুরের মুখখানা নেমে আসছে অপরূপার ওষ্ঠদ্বয়ের দিকে।

অপরূপা লজ্জাবতী লতার মত দেহটা এলিয়ে দিয়েছে বনহুরের বাহুবন্ধনে।

অপরূপার ওষ্ঠদ্বয়ের কাছাকাছি বনহুরের ওষ্ঠদ্বয় নেমে এসেছে ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুরের কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হলো মনিরার কণ্ঠস্বর—ওগো, তুমি কি করছো....তুমি না নিষ্ঠাবান সৎচরিত্র....তুমি না দুর্বলের সহায়ক...তুমি না মহান মহৎ...। ধীরে ধীরে বনহুরের বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে আসে মাথাটা সরিয়ে নেয় সে অপরূপার মুখের কাছ থেকে।

অবাক হয় অপরূপা, বিস্ময় নিয়ে তাকায় সে বনহুরের মুখের দিকে। অপরূপার দু'চোখ কেমন মায়াময় মনে হয়। কিছু বললো সে। চোখ দুটো আস্তে মুঁদে আসছে অপরূপার। ক্রমে তার হাতের উপর এলিয়ে পড়লো অপরূপা।

বনহুর এবার ওকে শুইয়ে দিলো নরম তুলতুলে শয্যায়। কিছুক্ষণ নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে, তারপর উঠে দাঁড়ালো, অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললো দরজার বা গুহামুখের দিকে।

বাইরে বেরুতে যাবে, অমনি তার নজরে পড়লো দু'জন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে দুটো ফুলের মালা হাতে। থমকে দাঁড়ালো বনহুর ভাবলো উপায় কি বাইরে বেরুবার। কিন্তু কোনো উপায় সে খুঁজে পেলো না, অতি সতর্কতার সঙ্গে তরুণীদ্বয় পাহারা দিচ্ছে।

অন্যান্য তরুণী যারা বীণা বাজাচ্ছিলো তারা এখন কেউ নেই।

বনহুর ফিরে এলো শয্যার পাশে।

অপরূপার মুখের দিকে তাকালো বনহুর। সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না সে। একরাশ সোনালী চুল ছড়িয়ে আছে ওর মাথার চারপাশে। মুদিত আঁখি। যেন একটি মোমের পুতুল।

বনহুর সচেতন হয়ে উঠলো—না এখানে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করা ঠিক হবে না। এই স্বপ্নরাজ্য তাকে ধীরে ধীরে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলছে, বাস্তব জগৎ থেকে যেন সরে আসছে ক্রমে ক্রমে।

কঠিন পৃথিবীর বলিষ্ঠ পুরুষ সে, সৌরজগতের অপরূপার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হলে তার চলবে না। সৌরজগতের অনেক রহস্য তার জানা হয়ে গেলো। না জানি দিপালী এখন কোথায় এবং কেমন আছে। আর কি বনহুর দিপালীর পাশে ফিরে যেতে পারবে? বনহুর ভাবছে আর এগুচ্ছে গুহামুখের দিকে।

তরুণীদ্বয় তখনও দাঁড়িয়ে আছে, উভয়ের হাতে ফুলের মালা। ওরা ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে, কখন বেরিয়ে আসবে অপরূপা আর তাদের নতুন আগন্তুক। বনহুর ফিরে গেলো টেবিলের পাশে, টেবিল থেকে তুলে নিলো তরল পদার্থসহ দু'টি পাত্র।

এবার বনহুর দু' হাতে দু'টি পাত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো এবং তরুণী দু'জন যারা পুষ্পহার নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো তাদের মুখের সামনে তুলে ধরলো।

তরুণীদ্বয় কোনো রকম দ্বিধা না করে পানীয় পান করলো। তারপর মালা দুটো ওরা দু'জনই একসঙ্গে পরিয়ে দিলো বনহুরের গলায়।

বনহুর কোনো বাধা দিলো না।

মাথা নত করে মালা দুটো গ্রহণ করলো।

সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো বনহুর। একটু পরে তরুণীদ্বয় কেমন যেন উচ্ছল হয়ে উঠলো, অবিরত হেসে চললো খিল খিল করে। সে হাসি যেন ঝরণার ধারা।

ওরা বনহুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

বনহুরও ওদের দু'জনের দিকে দু'হাত প্রসারিত করে দিয়ে বললো—এসো...

ওরা বনহুরের কথা ঠিক বুঝতে পারলো না। তবু দু'জন দু'পাশ থেকে এগিয়ে এলো।

বনহুর ওদের দু'জনকে নিয়ে এলো গুহা বা কক্ষে। যে শয্যায় অপরূপাকে বনহুর শুইয়ে দিয়েছিলো সেই শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে তরুণীদ্বয় বনহুরের দু'হাতের মধ্যে ছিন্ন লতার মত এলিয়ে পড়েছে।

বনহুর বুঝতে পারে এরা এখন সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। এবার তরুণীদ্বয়কে শুইয়ে দিলো সে অপরূপার পাশে।

ইচ্ছা করেও বনহুর আর দ্বিতীয় বার ফিরে তাকালো না তরুণীদের দিকে, একটা মোহময় আকর্ষণকে পরিহার করে সে বেরিয়ে এলো বাইরে।

দেখলো কেউ নেই আাশেপাশে, শুধু চারপাশে ছড়িয়ে আছে নানা বর্ণের উজ্জলদীপ্ত পাথর। বনহুর কোনোদিকে তাকালো না, পর্বতমালার গায়ে হেলান দিয়ে মাঝে মাঝে আত্নগোপন করে এগিয়ে চললো সে ঐ উদ্যানটির দিকে।

বনহুর অন্য কোনো পথ চেনে না, সে তাই উদ্যানের পথ ধরে দৌড়াতে শুরু করলো। কতকটা যেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে এগিয়ে যাচ্ছে। সৌরজগতের হাওয়ায় দেহটা যেন অতি হাল্কা মনে হয়।

উদ্যানের কাছাকাছি এসে পৌছতেই নজর চলে গেলো উদ্যানের মাঝামাঝি যেখানে বসে বসে বৃদ্ধটি বীণা বাজাচ্ছিলো। এতক্ষণে নজরে পড়লো বৃদ্ধের সম্মুখে তিনটি যবুক বসে আছে তারাও বীণা বাজাচ্ছে এক তালে।

বনহুর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে পারে না, মাত্র ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে দেখে নিলো, তারপর আবার সে দৌড়াতে শুরু করলো।

অনেকটা পথ।

ক্রমে হাঁপিয়ে উঠলো বনহুর।

এক সময় ঝরণার কিনারে এসে দাঁড়ালো, সুন্দর সচ্ছ পানি কল্ কল্ করে বয়ে চলেছে।

বনহুর দু'হাত বাড়িয়ে ঝরণার পানি তুলে নিলো। প্রাণভরে পান করলো সে, পৃথিবীর পানি আর এ পানিতে কোনো তফাৎ নেই। পানির স্বাদ সম্পূর্ণ এক।

প্রাণভরে পানি পান করে বনহুর অত্যন্ত প্রফুল্ল বোধ করলো। ভারি ভাল লাগছে এ মুহূর্তে, বয়স যেন তার কমে গেছে দশ বছর।

বনহুর আর বিলম্ব না করে দ্রুত এগিয়ে গেলো তার থেমে থাকা যানটির পাশে। হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর, যানটির পাশে একটি অদ্ভুত বস্তু পড়ে আছে।

বস্তুটি কি ঠিক অনুমান করতে পারলো না বনহুর। কাছাকাছি আসতেই ভীষণ চমকে উঠলো সে। বস্তটি এক অদ্ভুত ধরনের জীব।

মঙ্গল গ্রহে আসার পর এই প্রথম বনহুর একটি জীব দেখতে পেলো। জীবটা কি তা সে জানে না, ঠিক পৃথিবীর পাহাড়ী সাপের মত দেখতে। কিন্তু মুখটা গোল জলহস্তীর মত, দুটো সিং আছে দু'পাশে।

ভয়ঙ্কর জীব!

এ ধরনের জীব যে এই সুন্দর সৌরজগতে থাকতে পারে এটা কল্পনা করা যায় না।

বনহুর এগুতেই জীবটা মাথা তুলে তাকালো।

দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

বনহুর জীবটাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো। সে মনে করেছিলো কোনো জীব-জানোয়ার এখানে নেই, আছে শুধু মানুষ।

তা নয়, এখানেও ভয়ঙ্কর জীব বাস করে।

বনহুরের ভাববার সময় হলো না, জীবটা গড়িয়ে আসছে তার দিকে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর একটা উঁচু টিলা ধরনের বস্তুর পাশে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো। জীবটার দেহ একটা পাহাড়ী সাপের মত

হলেও কিছুটা খাটো লেজ বা শেষ অংশ সরু নয়, মোটা থেবড়ো। মাঝে মাঝে জীবটা হা করছে, ভিতরে লকলকে জিহ্বা যেন লেলিহান অগ্নিশিখা।

বনহুর টিলা জাতীয় বস্তুটার পাশে আত্মগোপন করে রেহাই পেলো না। সেই ভয়ঙ্কর জীবটা গড়িয়ে গড়িয়ে যানটার দিকে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে।

মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে বনহুর সরে দাঁড়ালো।

জীবটার দেহের ধাক্কায় গড়িয়ে পড়লো বিরাট আকার পাথরটা।

আর একটু বিলম্ব হলে পাথটার নিচে চাপা পড়ে যেতো বনহুর এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর সরে গেছে এটা জীবটার নজরে ধরা পড়ে গেলো।

সে মাথাটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে নিলো।

বনহুর যানটির দিকে দৌড়াতেই জীবটা তার পিছু ধাওয়া করলো।

বনহুর যানটার নিকটে পৌঁছবার পূর্বেই অদ্ভুত জীবটা গড়িয়ে এলো গড় গড় করে ঠিক বনহুরের কাছাকাছি। বনহুর লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ালো এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো একপাশে।

জীবটা বনহুর যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেই স্থানের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেলো ষ্টীম রোলারের মত। একটু হলেই পিষে থেতলে যেতো বনহুরের শরীরটা।

বনহুর দ্রুত সরে গিয়েছিলো মুহূর্তে তাই বেঁচে গেলো এবারও সে। জীবটা একপাশে গড়িয়ে অনেক দূর চলে গেলো, সেই ফাঁকে বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়ালো এবং যানটির পাশে গিয়ে উঠে পড়লো যানটির ভিতরে।

জীবটা অনেক দূরে গড়িয়ে গিয়েছিলো, সে মাথা উঁচু করে দেখলো তারপর যানটির দিকে গড়িয়ে আসতে শুরু করলো।

বনহুর বুঝতে পারলো এবার জীবটা তার যানটিকে ধাকা মেরে থেতলে ফেলবে এবং হত্যা করবে তাকে।

বনহুর যানটির চালনা কিছুটা বা শিখে নিয়েছিলো। সে প্রথম চাকতির মত সুইচটাতে চাপ দিতেই সাঁ করে উড়ে উঠলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, বনহুর সহ যানটি সাঁ সাঁ করে উপরে উঠে এলো।

জীবটা যানটির পাশে গড়িয়ে আসবার অনেক পূর্বেই অনেক উপরে চলে গেলো। বনহুর নিচে তাকিয়ে আর কিছু দেখতে পেলো না। মঙ্গল গ্রহের

অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যেও যে এমন ভয়ঙ্কর জীব আছে ভাবতে পারেনি সে। শুধু একটি নয়, এমনি হয়তো অনেক বিস্ময়কর জীব আছে যার সন্ধান সে এখনও জানতে পারেনি।

যানটি সৌরজগত ভেদ করে উপর দিকে উঠছে। তার ঠিক মাথার উপরে একটি দীপ্ত নীল আলোর বল জ্বলছে। তারই নীলাভ আলোকরশ্মিতে যানটির ভিতরে এবং বাহিরে আলোময় হয়ে উঠেছে।

বনহুর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। সে বেশ বুঝতে পারছে এবার তার মৃত্যু অনিবার্য। কারণ এ যানটি চালনায় সে দক্ষ নয়। চুপচাপ লুকিয়ে কিছুটা সে দেখেছিলো মাত্র, সেই অভিজ্ঞতায় একটা যান চালনায় জীবনের ঝুঁকি রয়েছে।

দুঃসাহসী বনহুর তবু ঘাবড়ালো না, একটির পর একটি সুইচ টিপতে লাগলো।

দ্বিতীয় সুইচ টিপতেই যানটি স্থির হয়ে শূন্যে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর সোজাসুজি চলতে লাগলো।

বনহুর লক্ষ্য করছে তার সম্মুখে একটি টেলিভিশন পর্দার মত পর্দা রয়েছে। সম্মুখে তিনটি ছোট্ট ছোট্ট সুইচ। বনহুর একটি সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ টেলিভিশন পর্দার মত পর্দায় ভেসে উঠলো অদ্ভুত দৃশ্য। সৌরজগতের রঙের মেলায় অসংখ্য তারার ঝাক। ঝাকগুলো ছুটে চলে যাচ্ছে একদিকে।

বনহুর দ্বিতীয় সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ভেসে উঠলো নিচে মঙ্গল গ্রহের পাহাড় পর্বত এবং রঙের খেলা।

মুগ্ধ বিস্মিত বনহুর।

ভাবছে পৃথিবীর মানুষের চেয়ে এরা কোনো অংশে কম নয়, বিজ্ঞানের দিক দিয়েও এরা দক্ষ। এমন ধরনের যান পৃথিবীর মানুষও বুঝি তৈরি করতে পারবে না। আমেরিকান অথবা রাশিয়ান রকেটের চেয়ে এ যান বিস্ময়কর।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই বনহুরের। যানটি এত দ্রুত চলছিলো যে তার গতি ছিলো রকেটের চেয়ে বেশি। লক্ষ লক্ষ মাইল এগুচ্ছিলো বিস্ময়কর যানটি।

এবার বনহুর তার সম্মুখস্থ তিন নম্বর চাকতি জাতীয় সুইচটার উপরে চাপ দিলো। ভাগ্যে যা থাকে ঘটবে, তা ছাড়া কিই বা করবার আছে তার।

যেমনি সে তিন নম্বর চাকতি জাতীয় সুইচে চাপ দিলো অমনি সাঁ সাঁ করে যানটি নিচে নামতে শুরু করলো।

উল্কাবেগে নামছে যানটি।

বনহুর শুধু হ্যান্ডেল চেপে বসে রইলো।

আর বুঝি রক্ষা নেই।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো বনহুর।

যানটি নেমে চলেছে, যে কোনো মুহূর্তে কোনো এক গ্রহের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যানটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে পারে।

যানটি এত দ্রুত ছুটছে তার প্রমাণ পাচ্ছে বনহুর সম্মুখস্থ পর্দায়। প্রায় ঘন্টাকয়েক কেটে গেলো, পর্দায় এখন শুধু অন্ধকার মনে হচ্ছে। তেমন কিছুই নজরে পড়ছে না, বনহুরের চোখ দুটো মুঁদে আসছে আপনা আপনি। বড় ঘুম পাচ্ছে বনহুরের। এটা কি তাহলে তার মরণ ঘুম? বনহুর কিছুতেই নিজকে নিদ্রামুক্ত রাখতে পারছে না। মাথাটা তার বারবার ঝুঁকে পড়ছে সামনের দিকে। হঠাৎ একটা প্রচন্ড শব্দ...তারপর কিছু মনে নেই বনহুরের।

এক সময় চোখ মেলে তাকালো বনহুর।

চারিদিকে জমাট অন্ধকার, তার সঙ্গে কানে ভেসে আসছে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ। শব্দটা কিসের বুঝতে পারলো না বনহুর। তা ছাড়া এটা কোন্ জায়গা তাও বনহুর অনুমান করতে সক্ষম হচ্ছে না।

গভীরভাবে ভাবছে, এখন সে কোথায়?

মনে পড়লো যানটির কথা।

সে যে বিস্ময়কর যানটির মধ্যে ছিলো এবার সে কথা ভালভাবে স্মরণ হলো। যানটি কোথায় এবং সে এখন কোথায়? চারদিকে অন্ধকার, মাথায় প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করছে।

অন্ধকারে ভালভাবে তাকালো কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। শরীরে একটা বাতাস অনুভব করলো, বড় সুন্দর মনোরম বাতাস, এমন বাতাস তার দেহে বহুদিন স্পর্শ করেনি। শব্দটা কিসের, ঠিক সমুদ্রের গর্জনের আওয়াজ বলে মনে হচ্ছে। সৌরজগতে সমুদ্রের গর্জন? তা কি করে সম্ভব।...প্রচন্ড শব্দ, তার সঙ্গে প্রচন্ড আঘাত তারপর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো সে। কতক্ষণ পর তার সংজ্ঞা ফিরে এলো তা সে নিজেও ঠিক জানে না।

দু'হাত বাড়িয়ে অনুভব করার চেষ্টা করতেই চারপাশে কেমন সব এলোমেলো বস্তু হাতে ঠেকলো। কি এ বস্তুগুলো তা বুঝতে পারছে না। বড় ক্লান্ত অবসন্ন লাগছে দেহটা।

বনহুর চোখ বন্ধ করলো।

ঝিমঝিম করছে মাথাটা, সব যেন এলোমেলো হয়ে আছে। আবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো বনহুর।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না বা জানতে পারে না বনহুর। সমস্ত শরীর যেন গরমে পুড়ে যাচ্ছে। বনহুর চোখ মেলে তাকাতেই মন তার আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো, সূর্যের তাপে চোখ তার ঝলসে যাবার উপক্রম হলো।

সোজা হয়ে বসতেই সম্মুখে দৃষ্টি চলে গেলো, স্পষ্ট দেখতে পেলো তার অবস্থান হতে মাত্র কয়েক গজ দূরে সমুদ্রে গর্জন করে চলেছে।

বনহুর যে বস্তুটার মধ্যে আটকা পড়ে আছে সেটা সৌরজগতের বিস্ময়কর যান, যেটা সে নিজে চালনা করছিলো। ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ছে, তাহলে সে বাস্তব জগতে, মানে পৃথিবীর বুকে এসে পড়েছে? সৌরজগতের মনোরম পরিবেশ আর বাস্তব জগতের কঠিন মাটির পরশ......বনহুর প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো। স্বপ্নময় জগৎ থেকে সে যেন বাস্তব জগতে ফিরে এলো। কতদিন বনহুর সূর্যের তাপ অনুভব করেনি, কতদিন পৃথিবীর মুক্ত বাতাস গ্রহণ করেনি। সৌরজগৎ যতই স্বপ্নময় মধুর রাজ্য হোক, পৃথিবীর মানুষের কাছে তা সর্বকালের জন্য মনোরম অথবা তৃপ্তিদায়ক নয়। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, যানটি ভাগ্যিস সমুদ্রগর্ভে কিংবা কঠিন মাটির উপর পড়েনি, পড়লে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো আর দেহটা, পৃথিবীর আলো-বাতাস আর কোনদিন সে উপভোগ করার সুযোগ পেতো না।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো, এখন সে অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। মাথায় হাত দিয়ে দেখলো বেশ কিছুটা জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত জমাট বেঁধে আছে এবং সে কারণেই মাথাটা অমন অবশ লাগছিলো।

বনহুর যানটির ভগ্নাংশের মধ্য হতে বেরিয়ে এলো। সমুদ্রের ঠিক কিনারেই বালুকারাশির মধ্যে যানটি এসে পড়লো তাই হয়তো জীবনে বেঁচে গেছে বনহুর, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

সমুদ্রের কিনারে একেবারে পানির পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর। ঠান্ডা বাতাসে রোদ্রের প্রখরতা কিছুটা হাল্কা মনে হচ্ছে। বনহুর সমুদ্রে পানি তুলে

নিয়ে মাথায় দিলো, চাপ চাপ রক্তগুলো পরিষ্কার করে নিলো সে। কিছুটা পানি মুখে নিয়ে স্বাদ গ্রহণ করলো।

সমুদ্রের পানি হলেও তেমন লোনা নয়, তাই চোখমুখ জ্বালা করলো না।

রক্তগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো বনহুর। ঠিক ঐ মুহূর্তে মনে পড়লো দিপালীর কথা। এতক্ষণ মস্তিষ্কের যন্ত্রণায় এবং সংজ্ঞাহীনের মত অবস্থা হওয়ায় বনহুর দিপালীর কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলো। এবার দিপালীর স্মরণ হতেই মনটা ধক্ করে উঠলো। দিপালী তাহলে মঙ্গল গ্রহে রয়ে গেলো....না জানি সে কি ভাবছে, কেমন আছে তাই বা কে জানে। দিপালী নিদ্রায় মগ্ন ছিলো, সেই সময় বনহুর বেরিয়ে এসেছিলো সেই কক্ষ থেকে......তারপর কি কি ঘটেছিলো একের পর এক ছায়াছবির মত মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো তার।

মঙ্গল গ্রহেও যে মানুষ বসবাস করে তা কল্পনার বাইরে হলেও বনহুরের কাছে অজ্ঞাত নেই। সে এ-ব্যাপারে এখন একেবারে নিঃসন্দেহ, কারণ সে নিজে মঙ্গল গ্রহে অবস্থান করেছে একপক্ষ কালের বেশি। চন্দ্রপৃষ্ঠেও সে অবতরণ করতে পারতো কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠে অক্সিজেন না থাকায় সেই বাসনা তার পূর্ণ হয়নি।

বনহুর যা দেখেছে বা উপলব্ধি করেছে তা তার কল্পনার নয়—বাস্তব। বনহুর দিপালীকে নিয়ে ফিরে আসতে পারেনি সেজন্য বড় বিষণ্নব্যথিত হয়ে পড়লো। তবু তাকে চলতে হবে, বসে বসে ভাবলে চলবে না।

অদৃষ্ট প্রসন্ন বলেই বনহুর হয়তো পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসতে সক্ষম হলো। আফসোস্ রয়ে গেলো দিপালীকে সে ফিরিয়ে আনতে পারলো না......দিপালীর কথা ভাবছিলো আর এগুচ্ছিলো বনহুর সমুদ্রতীর ধরে। সে জানে না এটা কোন্ দেশ বা কোন রাজ্য। সমুদ্রের গর্জন আর সীমাহীন পানি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না।

পেছনে পড়ে রইলো সেই বিস্ময়কর যানটির ধ্বংসাবশেষ অনেকটা পথ বনহুর চলে এসেছে তারপর পুনরায় সে ফিরে তাকালো সেই অদ্ভুত যানটির ভগ্নাংশের দিকে। দু'চোখ ভরে পানি এলো, ঐ যানটির সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে দিপালীর স্মৃতি।

❑

রহমান যখন হসপিটাল থেকে ছাড়া পেলো তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ কিন্তু তার বাম হাতখানা দেহ থেকে কেটে বাদ দিয়ে ফেলা হয়েছে। রহমান নিজেও নিজ হাতের কিছু অংশ পাথর দ্বারা দ্বিখন্ডিত করে ফেলেছিলো তবু দেহের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল কিছুটা। ঐ অবস্থায় রহমানের জ্ঞান লোপ পেয়েছিলো। কখন কে বা কারা তাকে হাসপিটালে এনে ভর্তি করেছে কিছুই স্মরণ নেই রহমানের।

যেদিন রহমান সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছিলো সেদিন চোখ মেলে অবাক হয়ে গিয়েছিলো সে, কারণ অল্পক্ষণেই বুঝতে পেরেছিলো সে এখন কোনো হসপিটালে রয়েছে।

তার শরীরে স্যালাইন পুশ করা হচ্ছে। নাকের মধ্যে অক্সিজেন পাইপ। পাশে ডাক্তার এবং নার্স।

রহমান চোখ মেলেই বলে ছিলো—আমি এখন কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে নার্স মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলো সেদিন চুপচাপ ঘুমাও, পরে সব জানতে পারবে।

রহমান সেদিন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেনি। কিন্তু পরে সে সব জানতে পেরেছিলো। তবে নার্সের মুখে নয়, সুইপারের মুখে।

বলেছিলো সুইপারটি, নিম্‌লী কয়লাখনির কিছু অংশ ধ্বংস হওয়ায় হসপিটাল থেকে উদ্ধার কারী দলের সঙ্গে এম্বুলেন্স গিয়েছিলো, তারা ফেরার পথে রাস্তার ধারে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে নিয়ে আসে এবং হসপিটালে ভর্তি করে নেয়। এর বেশি কিছু তার ঐ মুহূর্তে জানার বাসনা ছিলো না।

ক্রমে সে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো তখন সে সব জানতে পারলো। এখন যে হসপিটালে রয়েছে সে হসপিটাল ঝাম দেশের সীমানার ওপারে মহিশানুগড়।

সম্পূর্ণ নতুন দেশ।

মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিলেও কোনদিন রহমান কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, কারণ এ হসপিটাল শত্রুপক্ষ না মিত্রপক্ষ তা জানে না সে। না জানি কোন্ মুহূর্তে তার চেনা কোনো শত্রু এসে পড়বে এবং তাকে হত্যা করবে কৌশলে। রহমান মৃত্যুকে ভয় করে না তবে তার যে অনেক জানার

বাকি আছে। সর্দার এবং দিপালী কোথায়, তারা কি সেই ভূগর্ভ গোপন আস্তানায় বন্দী ছিলো, তারাও কি মৃত্যুবরণ করেছে প্রচন্ড বিস্ফোরণে......কিন্তু কে দেবে তার জবাব!

রহমান হসপিটালের বেডে শুয়ে শুয়ে ভাবতো অনেক কথা, অনেক কিছুই। একটি হাত সে জন্মের মত হারিয়েছে তবু তার দুঃখ নেই, দুঃখ সর্দারের জন্য।

যেদিন রহমান ছাড়া পেলো সেদিন সে সুস্থ কিন্তু মানসিক চিন্তায় ভীষণ অসুস্থ বলা যায়। নানা চিন্তাভাবনা নিয়ে হসপিটালের বাইরে এসে দাঁড়ালো। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে রহমান ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গাড়ি চলে গেলো তার সম্মুখ দিয়ে।

রহমান সেদিকে খেয়াল করেনি, সে আপন মনে এগুচ্ছিলো, হঠাৎ গাড়িখানা পিছু হটে একেবারে তাকে চাপা দেয় আর কি।

রহমান লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

গাড়ির মধ্যে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলো রহমান—তার পরিচিত মুখ। এ মুখ সে ক্যারিলংকের গোপন আড্ডাখানায় দেখেছে।

কিন্তু ভাববার সময় নেই, গাড়িখানা কিছুটা পিছিয়েই আবার তাকে চাপা দেবার জন্য তীরবেগে এগিয়ে আসছে।

রহমান ক্ষিপ্রগতিতে পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো একেবারে দেয়ালের সঙ্গে মিশে।

গাড়িখানা তাকে চাপা দেবার জন্য দেয়াল ঘেঁষে রহমানের প্রায় গাঁ ছুয়ে চলে গেলো।

মৃত্যুর মুখ থেকে রহমান ঐ মুহূর্তে রক্ষা পেলো।

কিন্তু সেখানে আর মুহূর্তও দাঁড়ালো না। দৌড়ে গিয়ে সম্মুখের এক হোটেলে ঢুকে পড়লো এবং ভিড়ের মধ্যে আত্নগোপন করে একটা টেবিলে বসলো। টেবিলে বসেও সে নিশ্চিন্ত হলো না, দৃষ্টি রাখলো হোটেলের দরজার দিকে। যদি ওরা পুনরায় ফিরে এসে হোটেলের মধ্যে তাকে আক্রমণ করে বসে!

রহমানের সম্মুখের টেবিলে খাবার সাজানো ছিলো, সে ঐ খাবার থেকে কিছু খাবার খেতে শুরু করলো। বয় এক কাপ কফি রেখে গেলো তার সামনে।

রহমান কফির কাপ তুলে নিতেই হঠাৎ একটা ছোরা এসে লাগলো কাপটার গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে কফির কাপটা ভেঙে পড়লো এবং গরম কফি ছড়িয়ে পড়লো টেবিলে।

রহমান টেবিলে বসেই খাবার তুলে নিয়েছিলো, কারণ কেউ যেন বুঝতে না পারে সে এই মুহূর্তে হোটেলে প্রবেশ করেছে। খেতে খেতেই নজর রেখেছিলো রহমান হোটেলের দরজার দিকে।

হোটেলে যারা প্রবেশ করছিলো তারা সম্পূর্ণ নতুন মুখ। গাড়িতে যে মুখ দুটো রহমান একনজর দেখেছিলো সে মুখ তার মনের পর্দায় ভালভাবে আঁকা হয়ে গেছে, কাজেই চিনতে তার ভুল হবে না।

হঠাৎ কফির কাজটা লক্ষ্য করে কে ছোরা নিক্ষেপ করলো তা সঠিক নির্ণয় করা না গেলেও বেশ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো রহমান, এমন কেউ এ হোটেলে আছে যে তাকে লক্ষ্য করছে।

কফির কাপটা ছোরার আঘাতে ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলে একটা ভয়ার্ত ভাব পরিলক্ষিত হলো।

অনেকেই টেবিলে খাবার রেখে উঠে দাঁড়ালো এবং রহমানকে লক্ষ্য করে চাপা গলায় কিছু বলতে লাগলো।

রহমান ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে সেই দুটো মুখ নজরে পড়ে কিনা। তার হাতের কাপে কে ছোরা নিক্ষেপ করলো এবং কেন করলো এটা ভেবে পাচ্ছে না সে। রহমান ওখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে নতুন কোনো বিপদ আসতে পারে তাই সে দ্রুত সরে গেলো।

হোটেলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো, ক্রমে তা শান্ত হয়ে এলো।

রহমান একটা ক্যাবিনে গিয়ে বসলো।

ক্যাবিনে অন্য কেউ ছিলো না।

রহমান চেয়ারে বসে ক্যাবিনের আয়নায় দৃষ্টি রাখলো। তার পেছন দিকটা রয়েছে দরজার দিকে কিন্তু সে আয়নায় সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো।

ক্যাবিনটার মধ্যেও সে বেশিক্ষণ থাকবে না, আলগোছে সরে পড়বে সেখান থেকে, সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে।

হঠাৎ আয়নায় একটি তরুণীর ছায়া পড়লো।

সজাগ হয়ে বসলো রহমান।

তরুণী সোজাসুজি এসে তার কাঁধে হাত রাখলো। যেন সে তার কত পরিচিত।

রহমান কিন্তু ওকে কোনোদিন দেখেনি বা চেনে না। হঠাৎ তরুণী এভাবে তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াতে পারে ভাবতেও পারেনি সে।

তরুণীর মুখে চোখ দুটো তুলে ধরে রহমান বললো—কে আপনি?

তরুণী হেসে বললো—আপনার জীবনরক্ষা কারী....

কিন্তু কথা তার শেষ হলো না—একটা সূতীক্ষ্ণধার ছোরা এসে বিদ্ধ হলো তরুণীর বুকে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে তরুণী লুটিয়ে পড়লো রহমানের দেহের উপর।

রহমান তরুণীর রক্তাক্ত দেহটা ধরে ফেললো এবং অতি সাবধানে শুইয়ে দিলো মেঝের কার্পেটের উপর। তারপর ছোরাখানা তরুণীর বুক থেকে টেনে তুলে নিলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হোটেলের মালিকসহ আরও কয়েক ব্যক্তি প্রবেশ করলো সেই ক্যাবিনে। তাদের সঙ্গে রয়েছে দু'জন পুলিশ।

রহমান ছোরা হাতে উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গেই হোটেলের মালিক বলে উঠলো—এই লোকটা আমার হোটেলের ড্যান্স সিষ্টারকে হত্যা করেছে...একে-এরেষ্ট করুন।

রহমান কিছু বলবার পূর্বেই পুলিশ দু'জন তাকে অস্ত্রের মুখে বন্দী করে ফেললো। একখানা হাত তার সেই হাতেই হাতকড়া পরিয়ে কোমরের দড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেললো।

চারিদিকে তাকালো রহমান, দেখলো গাড়ির মধ্যে যে দুটো মুখ সে তখন দেখেছিলো ঐ দু'ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। এখন বুঝতে পারলো গাড়িচাপা দিয়ে তাকে হত্যা করতে চেয়ে কৃতকার্য না হওয়ায় শত্রু দু'টি হোটেলে প্রবেশ করে। কিন্তু এরা কারা? নিশ্চয়ই ক্যারিলংকোর আস্তানার এবং তার দলের লোক। রহমানকে ওরা বন্দী করে নিয়ে চললো।

বিপদের উপর বিপদ।

তবু রহমান ঘাবড়ে গেলো না, কারণ সে বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিলো।

রহমানকে নিয়ে ওরা সামনের রাস্তায় থেমে থাকা গাড়িখানায় চেপে বসলো।

একজন বসলো ড্রাইভ আসনে।

অপরজন বসলো রহমানের পাশে।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

রহমানের পাশে যে বসেছিলো সে বললো—বন্ধু, তুমি আমাদেরকে চিনতে না পারলেও আমি ঠিক তোমাকে চিনে নিয়েছি।

রহমান কোনো জবাব দিলো না।

ড্রাইভ আসন থেকে বললো অপরজন—এই ব্যক্তিরই সঙ্গী এবং সঙ্গিনী আমাদের মালিককে উধাও করেছে। নাহলে মালিক ক্যারিলং গেলেন কোথায়? একে আমরা গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করলে কিছু জানতে পারতাম না।

পাশে বসা ব্যক্তি বললো—হাঁ, ঠিক বলেছো জন। একে হত্যা করলে আমরা কিছু জানতে পারতাম না।

ড্রাইভ আসন থেকে বললো প্রথম ব্যক্তি কথা আদায় করে নেবার পর একে হত্যা করতেই হবে, কারণ এই ব্যক্তিই আমাদের ভূগর্ভ আস্তানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। একে হত্যা না করা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি নেই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো—আমি অবাক হচ্ছি এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার মধ্য হতে কি করে ও জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।

প্রথম ব্যক্তি বললো—ভাগ্যিস আমরা ভূগর্ভ আস্তানায় ভিতরে ছিলাম না, তাই রক্ষা পেয়ে গেছ, নইলে দেহটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো....

ব্যক্তিদ্বয় যখন কথাবার্তায় মশগুল ছিলো তখন রহমান কৌশলে হাতকড়া সহ হাতখানা মাজায় বাঁধা রশির ভিতর থেকে খুলে নেয়।

ওরা একটুও বুঝতে পারে না, কারণ রহমানের হাতখানা পিছমোড়া করে বাঁধা ছিলো তাই ওরা দেখতে পেলো না।

হাতকড়া সহ হাতখানা রহমান এক ঝটকায় সম্মুখে এনে প্রচন্ড আঘাত করলো পাশের শয়তানটির মাথায়।

সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে ঢলে পড়লো গাড়ির আসনের উপরে।

ড্রাইভ আসন থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি ফিরে তাকাতেই রহমান তার মাথায় প্রচন্ড আঘাত করলো, অমনি গাড়ির হ্যান্ডেলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো সে।

রহমান মুহূর্ত বিলম্ব না করে হাতকড়া সহ হাতখানা দিয়ে গাড়ির হ্যান্ডেল চেপে ধরলো।

গাড়িখানা ঘুরপাক খেয়ে আবার সোজা চলতে শুরু করলো।

যখন রহমান শয়তানদ্বয়কে হাতকড়া সহ হাত দিয়ে মাথায় আঘাত করেছিলো তখন ভাগ্যিস পথে কোনো যানবাহন অথবা কোনো পথিক ছিলো না। নইলে হয়তো তার গাড়িখানাকে বাধার সম্মুখীন হতে হতো।

রহমান হাতকড়া সহ দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালনা করে চললো। পূর্ব হতেই রহমান গাড়ি চালনায় দক্ষ ছিলো আজ এক হাত বিহীন হয়েও সে পূর্বের ন্যায় গাড়ি চালিয়ে চললো।

কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ গাড়ি চালানো তার পক্ষে কষ্টকর হচ্ছিলো, কারণ পায়ের নিচে এক শয়তানের সংজ্ঞাহীন দেহ পড়ে আছে। পিছন আসনেও আর একজনের সংজ্ঞাহীন দেহ, কাজেই এভাবে রাজপথে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া একেবারে নিরাপদ নয়।

রহমান গাড়িখানাকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে থামিয়ে ফেললো। তারপর চারপাশে তাকিয়ে দেখলো আশেপাশে কেউ নেই।

গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লো রহমান, তারপর একজনের সংজ্ঞাহীন দেহ তুলে নিলো কাঁধে এবং পাশের একটা ডাষ্টবীনের আবর্জনার মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিলো। তারপর পুনরায় ফিরে এলো গাড়ির পাশে।

পেছন আসন থেকে তুলে নিলো অপর ব্যক্তির সংজ্ঞাহীন দেহটা।

কিন্তু তাকে কাঁধে তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা ফিরে এলো লোকটার তবে একেবারে সজাগ হলো না। তাকেও ঐ ডাষ্টবীনে ছুড়ে দিয়ে দৌড়ে ফিরে এলো গাড়ির পাশে।

রহমান গাড়িতে চেপে বসে ষ্টার্ট দেবার পূর্বেই সংজ্ঞা ফিরে আসা লোকটা ডাষ্টবীনের আবর্জনার মধ্যে উঠে দাঁড়ালো এবং চিৎকার করে সাহায্য কামনা করে চললো।

ততক্ষণে গাড়ি ছুটতে শুরু করেছে।

লোকটার চিৎকার রহমানের কানে প্রবেশ করেছিলো কিন্তু সে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে গাড়ি নিয়ে হাওয়ার বেগে চলে গেলো।

রহমান বুঝতে পারলো লোকটা যখন তাকে দেখে ফেলেছে তখন নিশ্চয়ই তার গাড়িখানাকে ধরে ফেলার চেষ্টা করবে, কাজেই সে যতদূর সম্ভব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চললো।

কিন্তু এই গাড়ি নিয়ে সে এগুনো সমীচীন মনে করলো না, কারণ গাড়ির নম্বর জানিয়ে তারা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে এবং তাকে গ্রেপ্তার করতে বেশি বিলম্ব হবে না।

রহমান গাড়ি নিয়ে দ্রুত চলছে এবং ভাবছে এখন তার করণীয় কি?

এখানের পথঘাট তার পরিচিত নয়, তাই সে এলোপাথাড়ি চলছে।

ওদিকে সেই ডাষ্টবীনের আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত শয়তান দুটির সংজ্ঞা ফিরে এসেছে, তারা উঠিপড়ি করে ফিরে এলো পথের মোড়ে এবং একটি ভাড়াটে গাড়িতে উঠে বসলো।

ওরা ওদের আড্ডাখানায় ফিরে এলো।

ভূগর্ভ আস্তানা ছাড়াও তাদের আরও আস্তানা রয়েছে। একটি গাড়ি নিয়ে ওরা দু'জন এসে পৌঁছে গেলো তাদের এক নম্বর আস্তানায়। দৌড়ে প্রবেশ করলো তারা একটি মেশিন ঘরে এবং সুইচ টিপে দিয়ে টেলিভিশন ধরনের একটি মেশিন চালু করে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশন পর্দায় ফুটে উঠলো একটি গাড়ির ভিতর অংশ। হাতে হাতকড়া, এক হাতেই গাড়ি চালিয়ে চলেছে রহমান।

রহমান জানে না গাড়ির ভিতরেই রয়েছে এক বিস্ময়কর টেলিভিশন ক্ষুদে ক্যামেরা। ঐ ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাচ্ছে গাড়ির ভিতর অংশ। কোন্ পথে চলেছে, শহরের কোন্ প্রান্তে তাও ওরা টের পেয়ে গেলো মুহূর্তে।

গাড়ি নিয়ে ছুটলো ওরা। পথ ওদের অপরিচিত নয়, তাই অল্পক্ষণেই ঠিক জায়গামত পৌঁছে গেলো।

রহমান যখন রেললাইনের পাশ কেটে এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন সে দেখলো একখানা মোটর তার মোটরখানার পেছনে এগিয়ে আসছে। রহমান বুঝতে পারলো কেউ তার গাড়িখানাকে ফলো করছে।

ঐ মুহূর্তে রেললাইনের ঠিক গেটমুখে এসে রহমান হতবাক হয়ে গেলো, গাড়িখানা তার আর একটুও এগুবে না। কারণ ট্রেন প্রায় এসে গেছে ওদিক থেকে।

রহমান এগুতেও পারে না, কারণ সম্মুখে গেট বন্ধ।

ওদিকে পেছনের গাড়িখানা এসে গেছে তার গাড়ির প্রায় কাছা-কাছি।

রহমান বিলম্ব না করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো এবং সম্মুখের চলন্ত ট্রেন লক্ষ্য করে দৌড় দিলো।

গাড়িখানা ষ্টেশন ছেড়ে সবেমাত্র গতি বাড়িয়ে দিচ্ছিলো, তাই ট্রেনের গতি কিছুটা মন্থর ছিলো। রহমান পেছনের শেষ গার্ডের গাড়ির রেলিং ধরে গাড়িতে উঠে পড়লো। ট্রেন তখন স্পীডে চলতে শুরু করে দিয়েছে।

পেছন গাড়িখানা থেকে দুটো লোক দু'জন এই দৃশ্য লক্ষ্য করে ট্রেনের দিকে গুলী ছুড়তে শুরু করলো।

কিন্তু ততক্ষণে ট্রেনখানা উল্কাবেগে চলতে শুরু করেছে। শয়তান লোক দু'টির পিস্তলের গুলী ট্রেনের পিছন অংশ স্পর্শ করতে সক্ষম হলো না।

রহমান ট্রেনের রেলিং ধরে উঠে গেলো উপরে, তারপর গাড়ি যখন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করলো তখন সে কৌশলে প্রবেশ করলো গার্ডের গাড়ির ভিতরে।

গার্ড একখানা বই তুলে নিয়ে সবে মনোযোগ দিতে যাচ্ছিলেন অমনি তার নজর পড়লো এক হাতবিহীন রহমানের উপর। চমকে উঠলেন গার্ড সাহেব এবং ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলেন—কে তুমি?

রহমান নিজের হাত কড়া সহ হাতখানা তুলে তাকালো হাতের দিকে, তারপর ফিরে তাকালো সে গার্ড সাহেবের দিকে।

গার্ডের চোখেমুখে ভয় বিস্ময়, পুনরায় বললেন তিনি—কে তুমি? কি করে চলন্ত ট্রেনে উঠে এলে?

রহমান বললো—আমি বিপদগ্রস্ত এক বিদেশী। গাড়ি ধীরে চলাকালে আমি উঠে পড়েছি, কারণ শত্রু আমার পিছু তাড়া করেছিলো। আমি কি আসনে বসতে পারি?

গার্ড বললো—নিশ্চয়ই বসতে পারো কিন্তু কোনোরকম অসুবিধা সৃষ্টি করলে তুমি বিপদে পড়বে।

হাঁ, আমি তা জানি কিন্তু আপনিও যদি আমাকে কোনো রকম বিপদে ফেলতে চেষ্টা করেন তাহলে আমার হাতের হাতকড়া দিয়ে আপনাকে খতম করতে দ্বিধাবোধ করবো না। কথাগুলো বলে আসন গ্রহণ করলো রহমান।

গার্ড এর মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিলেও তিনি নীরব রইলেন তবে সুযোগ পেলেই সম্মুখের ষ্টেশনে জানিয়ে দিবেন। মনোভাব গোপন রেখে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন তিনি।

রহমান বসে বসে ভাবছিলো।

বহু কথা তার মনের আকাশে ভিড় জমিয়ে তালগোল পাকাচ্ছিলো। কখন যে দু'চোখে তন্দ্রা নেমে আসে খেয়াল নেই তার। হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে

গাড়ি থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে চাইতেই দেখতে পায় গার্ড সাহেব পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

রহমান চোখ রগড়ে বলে—একি বন্ধু?

গার্ড বললেন—একটুও নড়ো না, নইলে গুলী ছুড়বো।

বললো রহমান—সেকি বন্ধু, অসহায়ের উপর নির্যাতন।

চুপ করে থাকো, পুলিশকে টেলিফোন করা হয়েছে। তারা এলো বলে।

কিন্তু সে সুযোগ পেলে তো কথা শেষ না করেই রহমান গাড়ির দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠে—ঐ তো পুলিশ এসে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকালেন গার্ড সাহেব।

অমনি রহমান তার তলপেটে প্রচন্ড এক লাথি মারলো।

চীৎ হয়ে পড়ে গেলেন গার্ড সাহেব। তাঁর হাতের পিস্তলখানা পড়ে গেলো ছিটকে ট্রেনের মেঝেতে।

রহমান ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পিস্তল তুলে নিলো হাতে, তারপর ট্রেনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো নিচে।

ঐ মুহূর্তে পুলিশ দলবল নিয়ে ট্রেনের পেছন অংশে গার্ডের গাড়ির দিকে ছুটে আসছে।

রহমান পিস্তল হাতে ট্রেনের তলদিয়ে ওপাশে চলে গেলো। এক নিমিশে সে পার হয়ে গেলো এবং ওপাশে দেখলো একটা ঘোড়া গাড়ি যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছে।

কয়েক ধাপে সে লাইন পেরিয়ে ঘোড়াগাড়িটার পাশে এসে হাজির হলো।

ততক্ষণে পুলিশগুলো তার পেছনে ছুটতে শুরু করেছে। তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ছে পুলিশ দল।

রহমান একটা ঘোড়াগাড়ির কোচবাক্সে উঠে বসলো এবং হাতে কোচওয়ানের হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম কেড়ে নিলো।

কোচওয়ান কিছু বুঝবার পূর্বেই ঘোড়া ছুটতে শুরু করে দিলো।

তেজী ঘোড়া, লাগাম টেনে ধরার সঙ্গে সঙ্গে উল্কাবেগে ছুটতে আরম্ভ করেছে।

পুলিশবাহিনী দৌড়াচ্ছে আর গাড়িখানাকে লক্ষ্য করে পরপর গুলী ছুড়ছে।

কিন্তু তারা রহমান এবং গাড়িখানাকে ধরতে পারলো না, অল্পক্ষণেই তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

রহমান জানে, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলে আর রক্ষা নেই আবার তাকে কারাগারে ধুকে ধুকে জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু কত কাজ তার পড়ে রয়েছে, আস্তানায় সর্দার ফিরেছেন কিনা তাও জানে না সে। কাজেই তাকে যেমন করে হোক আস্তানায় পৌছতেই হবে।

কোচওয়ান যেন হাবাগোবা বনে গেছে।

কারণ হঠাৎ এমন এক অবস্থায় পড়বে সে তা কোনোদিন ভাবতে পারেনি। গরিব মানুষ তবু তো তার জীবনের মূল্য আছে। বাড়িতে আছে ছেলেমেয়ে স্ত্রী পরিবার, কাজেই তাকে বাঁচতে হবে।

গাড়ি চালিয়ে চলেছে রহমান।

পেছনে পুলিশের গুলীর আওয়াজ।

কোচওয়ান হতভম্ব।

অনেক পথ এলোপাতাড়ি গাড়ি চালিয়ে একটা নির্জন জঙ্গলের ধারে এসে রহমান ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো।

বললো রহমান—কোনো ভয় নেই বন্ধু, আমি বিপদে পড়ে তোমাকে কষ্ট দিলাম। এবার তুমি ফিরে যাও তোমার কাজে কথা শেষ না করেই রহমান ঘোড়াগাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো এবং গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হলো।

❑

দীর্ঘ সময় পথ চলে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লো বনহুর। সমুদ্রের তীর ধরে সে কয়েক দিন একটানা চলেছে। কোনো জাহাজ বা ষ্টীমারের সাক্ষাৎ লাভ তার ঘটেনি। পথের ধারে বনজঙ্গল থেকে ফলমূল যা পেয়েছে খেয়েছে। পানি পান করার সুযোগ তেমন আসেনি। সমুদ্রের পানি ক্রমেই তীব্র লোনা মনে হয়েছে। তবু সে ঐ পানি পান করার চেষ্টা করেছে বারবার।

বনহুর একদিন ধীরে ধীরে পথ চলছে।

সমুদ্র ত্যাগ করে সে চলে এসেছে দূরে, কোনো শহর বন্দর বা গ্রাম পায় কিনা সেই আশায়।

হতাশ হয়ে পড়েছে বনহুর।

এটা কোন্ দেশ তাও সে জানে না।

এত ক্লান্ত অবসন্নতার মধ্যেও ভীষণ একটা চিন্তা বনহুরকে অহরহ পীড়া দিচ্ছিলো তা হলো দিপালীর কথা। আর কোনোদিন দিপালী সৌরজগত থেকে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে পারবে না......

ভাবতে ভাবতে এগুচ্ছিলো বনহুর।

হঠাৎ তার চিন্তাধারায় বাধা পড়লো, দূরে বেশ দূরে একটা ছোট্ট কুটির নজরে পড়লো। নির্জন জনহীন জঙ্গলের ধারে কুটির এলো কি করে। একটা ক্ষীণ আশার আলো তার মনে উঁকি দিলো। বনহুর এগুতে লাগলো সেই কুটির লক্ষ্য করে।

এই নির্জন স্থানে কুটির কেন? এখানে কে বাস করে তাই বা কে জানে? কিছু ভেবে পায় না বনহুর।

এক সময় কুটিরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো সে। নিকটবর্তী হয়ে দেখলো শূন্য কুটির, কেউ নেই সেখানে। ঝাপ বা আগলা দরজা, তাতে তালা লাগানো রয়েছে।

বনহুর উঠে এলো কুটিরের বারান্দায়।

একপাশে একটা পানির পাত্র।

পানির পাত্রটির মুখে একটা গেলাস।

কলসীটার উপর নজর পড়তেই বনহুর আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো, পিপাসায় কণ্ঠনালী তার শুকিয়ে কাঠ হবার উপক্রম হয়েছে।

বনহুর কলসীটার পাশে বসে কলসীর মুখ থেকে গেলাস নিয়ে প্রাণভরে পানি পান করলো। এ যেন পানি নয় তার কাছে সুধা মনে হলো এ মুহূর্তে।

এক নিঃশ্বাসে কয়েক গেলাস পানি পান করে ফিরে তাকাতেই নজর পড়লো দূরে অনেক দূরে দু'জন লোক কুটিরটার দিকে এগিয়ে আসছে। ভালভাবে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো একজন নারী, অপর জন পুরুষ।

বনহুর বুঝলো, যারা এদিকে এগিয়ে আসছে তারা এই কুটিরের মালিক। কিন্তু তারা কেমন লোক কে জানে। তাকে তারা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে না শত্রু মনে করে আক্রমণ চালাবে কে জানে।

যদি তারা ভাল লোক হয় তাহলে তাকে আশ্রয় দেবে এবং তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। আর যদি তা না হয়......

সহসা বুদ্ধি আঁটলো বনহুর একেবারে সামনাসামনি না গিয়ে আড়ালে আত্মগোপন করে লক্ষ্য করা যাক এরা কি ধরনের ব্যক্তি। বনহুর তাড়াতাড়ি কুটিরের পেছনে এসে দাঁড়ালো। এমন জায়গায় দাঁড়ালো বনহুর যেখান থেকে সব দেখা এবং শোনা যাবে। কুটিরের পেছন অংশে কিছু আগাছা ধরনের ঝোপ-ঝাড় ছিলো, তারই মধ্যে লুকিয়ে দেখতে লাগলো।

ওরা দু'জন নিকটবর্তী হতেই বনহুর ভীষণ চমকে উঠলো। শুধু চমকেই উঠলো না, একটা তীব্র হিংস্র ভাব তার সমস্ত শরীর নাড়া দিয়ে গেলো। অস্ফুট কণ্ঠে বললো বনহুর—শয়তান মালোয়া, তুমি লোকচক্ষুর অন্তরালে এখানে আত্মগোপন করে আছো...কিন্তু তার সঙ্গিনীটি কে?

ততক্ষণে ওরা একেবারে কুটির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। তরুণীর পায়ে নুপুর রয়েছে, নুপুরের শব্দ বনহুর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। তরুণী সুন্দরী বটে কিন্তু বয়স নিতান্ত কম মনে হচ্ছে কে এই তরুণী.......মালোয়া নাসরিনের কন্যা ফুল্লরাকে চুরি করে পালিয়েছিলো। তবে কি এই তরুণী ফুল্লরা?

না না, তা হয় না, ফুল্লরা মালোয়ার সঙ্গে এই নির্জন কুটিরে বসবাস করছে...সত্যই কি ফুল্লরাকে নরপশু কলঙ্কিত করেছে...বনহুর অধর দংশন করতে লাগলো। কিন্তু সে অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে শুনতে চেষ্টা করলো ওদের কথাবার্তা। সত্যিই ও মালোয়া না অন্য কেউ এবং তার সঙ্গিনী তরুণীটি ফুল্লরা কিনা।

তবে মালোয়াকে চিনতে বনহুরের ভুল হয়নি। তবুও একটু সন্দেহ আছে, কারণ মালোয়ার মত দেখতে অপর কোনো ব্যক্তিও হতে পারে তো।

বনহুর কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো।

লোকটা তরুণী সহ বারান্দায় উঠে এলো।

তরুণী বললো—আমি আর পারবো না নেচে নেচে পয়সা কামাই করতে।

লোকটা ঘর খুলে একটা মাদুর এনে বিছিয়ে দিলো দাওয়ায়, বললো—বসে পড় ফুল্লরা জিরিয়ে নে......

ফুল্লরা! এই তরুণীই তবে তাদের হারানো ধন ফুল্লরা। বনহুরের হৃদয়ে কে যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলো। কত দিন ধরে বনহুর ও তার দলবল ফুল্লরাকে খুঁজে চলেছে কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায়নি। নাসরিনের

চোখের পানি বনহুরকে বিচলিত করেছে, রহমানের দীর্ঘশ্বাস বনহুরকে অস্থির করে তুলেছে, যদিও রহমান সর্দারকে কন্যা সম্বন্ধে বলে দুঃখ দেয় নি। বনহুর তবু বুঝতো রহমানের বুকে কত ব্যথা জমাট বেঁধে আছে। হাজার হলেও সে পিতা তো।

বনহুর নানা কাজের ফাঁকে সন্ধান করেছে।

একদিকে সে কাজ করেছে অপরদিকে খুঁজেছে সে ফুল্লরাকে কেউ কোথাও পায়নি তার সন্ধান।

আজ এত সহজে ফুল্লরার খোঁজ পাবে, এ যেন একেবারে কল্পনার অতীত বলে মনে হচ্ছে। তবে গভীরভাবে ভাবার বিষয়, কারণ এ কোন্ রাজ্য বোঝা মুশকিল। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো দেশ হবে যে দেশে বনহুর কোনোদিন পা রাখেনি।

মালোয়া ফুল্লরাকে চুরি করে দেশত্যাগ করেছিলো।

এই অজানা দেশে এসে আস্তানা গেড়েছে, সে কারণেই মালোয়াকে তারা খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়নি।

বনহুরের কানে ভেসে এলো মালোয়ার কণ্ঠস্বর—ফুল্লরা, তুই তো জানিস এখন তোর কোনো পথ নেই আমি ছাড়া। তোর ঐ রূপ-যৌবন সব তুই আমার হাতে সঁপে দে।

ফুল্লরার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর—ফের যদি ও কথা মুখে এনেছিস তা হলে তোর মাথায় দা দিয়ে কোপ মেরে তোকে খতম করবো। তুই যখন ঘুমাস তখন কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না, বুঝলি?

মালোয়ার গলার স্বর এবার নরম মনে হলো, সে বলছে—তোকে খুশি করবার জন্য আমি সব ত্যাগ করেছি। দল ছেড়ে চলে এসেছি দূরে বহু দূরে যেখানে কোনোদিন তোর বা আমার দলের কেউ সন্ধান পাবে না। কথাগুলো বলতে বলতে মাদুরের একপাশে বসলো মালোয়া। তারপর বেড়ায় গোঁজা হাতপাখাটা নিয়ে বাতাস করতে লাগলো ফুল্লরাকে।

ফুল্লরা পা থেকে নুপুর খুলে ছুড়ে ফেলে দিলো মাদুরের একদিকে, তারপর বললো—রেখে দে তোর দরদ, হাওয়া করতে হবে না। আমি বলে দিলাম আর শহরে যাবো না। পথে পথে নাচ দেখিয়ে পয়সা কামাবো না।

কেন, আজ হঠাৎ করে কি হলো তোর?

আমি আর নাচবো না।

মালোয়া বললো—না নাচলে নীলমণিহার কেড়ে নেবো।

বনহুর চমকে উঠলো না, একটা বিস্ময় তার দু'চোখকে উজ্জ্বল করে তুললো। নীলমণিহার তাহলে এখনও মালোয়া অথবা তার দলবল আত্মসাৎ করেনি? নীলমণিহার ফুল্লরার কাছেই আছে।

আনন্দে আত্মহারা হলো বনহুর।

এতক্ষণ যে কথাবার্তা শুনলো তাতে মনে হলো মালোয়া এবং ফুল্লরার মধ্যে কোনো অবৈধ সম্পর্ক নেই। তবু আরও জানার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলো বনহুর।

একটু পর ফুল্লরার কঠিন কণ্ঠস্বর—নীলমণিহার ছিনিয়ে নিবি বলে ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে আমাকে এতদিন হাতের মুঠায় রেখেছিস, নইলে কথা শেষ না করে ফুল্লরা উঠে দাঁড়ালো।

মালোয়ার হাসির শব্দের সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস আওয়াজ, বললো মালোয়া—নীলমণিহারই শুধু নয় ফুল্লরা, তোকে আজও আমি স্পর্শ করিনি কেন জানিস?

ফুল্লরার কোনো কণ্ঠ শোনা গেলো না।

বনহুর কান পেতে শুনছে।

মালোয়ার গলা—তুই মেয়েমানুষ আর আমি পুরুষ মানুষ। এতদিন ধৈর্য ধরে আছি শুধু তুই নাচিস গাস পয়সা কামাস সেই জন্য তোকে আমি.....

না, আমি আর নাচবো না।

তাহলে তুই আমার হাত থেকে রেহাই পাবি না। এতদিন ছোট ছিলি এখন অনেক বড় হয়েছিস......

ফুল্লরা বলে উঠলো—তুই আমার বাপের বয়সী...

ওসব বলে আর আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবিনে ফুল্লরা। এতদিন অনেক ধৈর্য ধরেছি শুধু তোকে হারাবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি কান্দাই ছেড়ে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে। তোর জন্য আমি হত্যা করেছি সর্দার হরিহরকে। হত্যা করেছি দলের অনেককে। যে তোর দিকে লালসাভরা চোখে তাকিয়েছে তাকেই আমি খতম করেছি। তবু মনে শান্তি পাইনি, না জানি কে কখন কোন্ ফাঁকে গলার নীলমণিহারটিও হারাবো সেই সেই সঙ্গে....ফুল্লরা তুই আমার। কেন তুই তা বুঝিস না?

খবরদার, এক পা এগিয়েছিস তো তোকে এই ছোরা দিয়ে খুন করবো।

হাঃ হাঃ হাঃ তুই আমাকে খুন করবি! এতটুকু পুঁচকে মেয়ের কথা শোনো। ফুল্লরা, এতদিন আমার কবল থেকে রক্ষা পেলেও আজ আর পাবি না।

বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসলো।

মনে মনে সে খোদাকে ধন্যবাদ জানালো, যা সে হারিয়েছিলো তা এভাবে এত সহজে পাবে, এ যে তার চিন্তার বাইরে ছিলো। খোদা তাকে ঠিক সময়মতই ঠিক জায়গায় এনে হাজির করেছে। বনহুর মালোয়ার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনলো। সে বুঝতে পারলো কান্দাই এখান থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে। তাহলে শয়তান ফুল্লরাকে নিয়ে একেবারে পৃথিবীর এক প্রান্তে চলে এসেছে। এটা কোন্ দেশ কে জানে....

বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, ফুল্লরার তীব্র কণ্ঠস্বর— মালোয়া, তুই আমাকে ধরিস না। তুই আমার বাপের মত...তুই আমার বাপ....

না, আমি তোর কেউ নই। তোকে আমি বিয়ে করবো...তুই আজ আমার হাত থেকে রক্ষা পাবি না। ফুল্লরা, তোকে আজ আমার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। ফেলে দে, ছোরা ফেলে দে বলছি, নাহলে তোর হাত মুচড়ে ভেঙে ফেলবো...দে ফেলে দে বলছি...

মালোয়া কথাটা বলে ফুল্লরাকে ধরবার জন্য এগিয়ে যায়।

ফুল্লরা ছোরাখানা খোঁপা থেকে খুলে নিয়ে উদ্যত করে ধরে দাঁতে দাঁত পিষে বলছিলো—তুই আমার বাপের মত কিন্তু নরপশু তার কোনো কথা শুনলো না। আজ সে ক্ষুব্ধ শার্দুলের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ফুল্লরার প্রতি তার যে লোভ ছিলো তা আজ একেবারে চরমে এসে পৌঁছেছে।

যেমনি মালোয়া ফুল্লরার ছোরা সহ হাতখানা ধরে ফেললো অমনি বনহুর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মালোয়ার চোয়ালে প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মালোয়া, কিন্তু সে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলো, কারণ বনহুরকে প্রথম নজরেই সে চিনতে পেরেছিলো। সে কি করে হঠাৎ এখানে এ মুহূর্তে এলো ভেবে পেলো না মালোয়া।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো মালোয়া।

মুখখানা তার মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে। ভয়ার্ত চোখে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

ফুল্লরা কিন্তু বনহুরকে চিনতে পারলো না, কারণ যখন মালোয়া তাকে চুরি করে তার বয়স তখন খুব কম ছিলো কাজেই এখন সর্দারের চেহারা তার মনে থাকার কথা নয়।

ফুল্লরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। এই বিপদ মুহূর্তে কে এই মহান ব্যক্তি তাকে ক্ষুব্ধ শার্দুলের কবল থেকে রক্ষা করলো।

ফুল্লরা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলো, বনহুরকে সে দেখছে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে—কে এই মহাপুরুষ, যাকে দেখে কুঁকড়ে গেছে মালোয়া। ওর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে এক ভয়ার্ত ভাব, যেমন মৃত্যুদূতকে দেখলে মৃত্যুযাত্রীর অবস্থা হয় ঠিক তেমনি।

বনহুর দাঁত পিষে বললো মালোয়া—আজ তোকে কে রক্ষা করবে? আর কোথায় পালিয়ে বাঁচবি তুই?

মালোয়া ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

বনহুর এগিয়ে গিয়ে বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরলো মালোয়ার জামার কলার, টেনে নিয়ে এলো উঠানের মাঝামাঝি।

মালোয়া তখন বলির ছাগলের মত কাঁপছে।

দু'হাতে সে বনহুরের পা চেপে ধরবার জন্য উবু হতেই বনহুর তার চুল ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়। এক সময় মালোয়ার মাথা নেড়ে ছিলো, আজ তোর মাথায় বাবড়ি চুল।

বনহুর চুল ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো—শয়তান, এতদিন আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন করেছিলি, কিন্তু আজ?

কথাটা বলেই প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো বনহুর, তারপর এক লাথি মারলো ওর পেটে।

কোঁকিয়ে উঠলো মালোয়া, মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। বনহুর ফুল্লরার হাত থেকে ছোরাখানা নিলো, তারপর বললো—তোকে হত্যা করবো না। যে অন্যায় তুই করেছিস তার জন্য তোর চোখ দুটো তুলে নেবো।

মালোয়া গোঙ্গিয়ে কেঁদে উঠলো—সর্দার বাঁচান আর কোনদিন এমন কাজ করবো না...বুক দিয়ে হামাগুড়ি খেয়ে বনহুরের পা চেপে ধরলো।

বনহুর ওর কোন কথায় কান দিলোনা ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ করে দিলো ওর বুকে। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—যা তোকে ক্ষমা করলাম। চোখ না তুলে একেবারে পরপারে পাঠিয়ে দিলাম।

ফুল্লরা এই ভয়াবহ দৃশ্য সহ্য করতে পারলো না সে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

মালোয়ার দেহটা নীরব হয়ে গেলো।

বনহুর এবার ফুল্লরার দিকে ঝুকে পড়লো তার সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলো কুটিরের বারেন্দায় মাদুরটার উপরে।

ফুল্লরার মুখখানা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলো বনহুর। হুবহু নাসরিনের মুখের প্রতিচ্ছবি। বনহুর কলসী থেকে ঠান্ডা পানি এনে ওর চোখেমুখে ছিটিয়ে দিতে লাগলো।

বনহুর কলসীতে ঠান্ডা পরিস্কার পানি দেখে প্রথমেই অবাক হয়েছিলো, এমন পানি এখানে এলো কি করে? বনহুর এতক্ষণ তেমনভাবে খেয়াল করে বুঝতে পারলো কুটিরের একপাশে একটি মেঠো কূপ রয়েছে।

পরিষ্কার পানির জন্যই মালোয়া এ কূপটি খনন করেছিলো তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুর ফিরে তাকালো ফুল্লরার ফুলের মত নির্মল সংজ্ঞাহীন মুখের দিকে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো ফুল্লরা।

বনহুরের মুখে দৃষ্টি পড়তেই ভীতভাবে বলে উঠলো—না না, আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমাকে আপনি হত্যা করবেন না।

বুঝতে পারলো বনহুর ফুল্লরা তাকে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। তা ছাড়া যে ঘটনা তার চোখের সামনে ঘটে গেলো তা একেবারে আকস্মিক ভয় পাবার কথাই বটে।

বনহুর একটু হেসে বললো—ভয় নেই ফুল্লরা, একটু সুস্থ হও, আমার পরিচয় পাবে।

ফুল্লরার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, কে এই ব্যক্তি যার কথায় আশ্বাসের সুর রয়েছে। যার মুখমন্ডল দীপ্তময়, দু'চোখে নেই হিংস্রতার ছাপ।

বললো বনহুর—কি দেখছো আমার মুখে ফুল্লরা?

ফুল্লরা চোখ নত করে নিলো, কোনো জবাব দিলো না?

বনহুর ফুল্লরার চুলে হাত বুলিয়ে ওর গলার লকেটটা উঁচু করে ধীরে বলে—এ নীলমনি কে দিয়েছিলো তোমাকে?

ফুল্লরা তাড়াতাড়ি গলায় হাতচাপা দিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—না, এটা আমি কোথায় পেয়েছি বলবো না।

বনহুর বুঝতে পারলো ফুল্লরা নীলমনি হার হারানোর ভয়ে কিছু বলতে রাজি নয়, তাই বনহুর আপন মুখেই বললো—ঐ নীলমনি হার যে তোমাকে উপহার দিয়েছিলো সেই তো আমি......

না, তুমি নও। নীল মনিহার আমাকে উপহার দিয়েছিলো আমাদের সর্দার....

ফুল্লরা? আমাকে ভাল করে দেখো দেখো আমি সেই কিনা?

আপনি! আপনি আমাদের সর্দার...

হাঁ হাঁ ফুল্লরা। আমি তোমাদের...

সর্দার! অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো ফুল্লরা। হয়তো তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো সর্দারের মুখ। এই সেই মুখ তাতে কোনো সন্দেহ রইলো না ফুল্লরার।

বনহুর ফুল্লরার হাত ধরে বললো—চলো ফুল্লরা, এখানে আর নয়। লোকালয়ের পথ তুমি নিশ্চয়ই চেনো, কাজেই কোনো অসুবিধা হবে না।

ফুল্লরা মাথা দুলিয়ে বললো—চিনি। পথ আমার জানা আছে!

বনহুর আর ফুল্লরা একবার ফিরে তাকালো মালোয়ার প্রাণহীন দেহটার দিকে।

ফুল্লরার মুখ থেকে এখন ভীতি ভাব মুছে গেছে। সে আনন্দদীপ্ত মুখে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর মৃদু হেসে বললো—চলো ফুল্লরা।

দু'জনে পা বাড়ালো সামনের দিকে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি তীর এসে বিদ্ধ হলো বনহুরের পায়ের কাছে।

ফুল্লরা আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো—সর্দার!

বনহুর তাকালো সম্মুখের দিকে।

পরবর্তী বই

অজানা দেশে